আমার বাংলা বই

ইবতেদায়ি চতুর্থ শ্রেণি

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের জাতীয় পতাকা

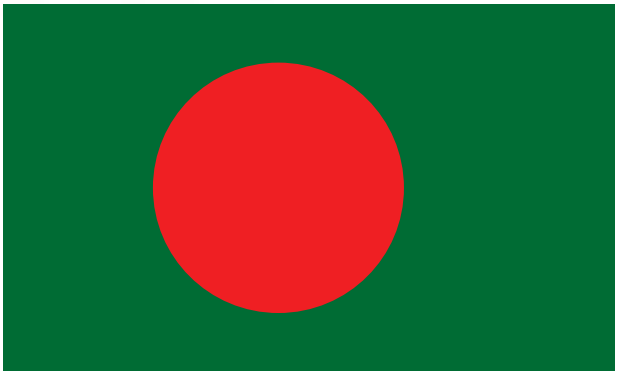

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের জাতীয় পতাকায় সবুজ ক্ষেত্রের উপর স্থাপিত রক্তবর্ণের একটি ভরাট বৃত্ত থাকবে।

পতাকা তৈরির নিয়ম

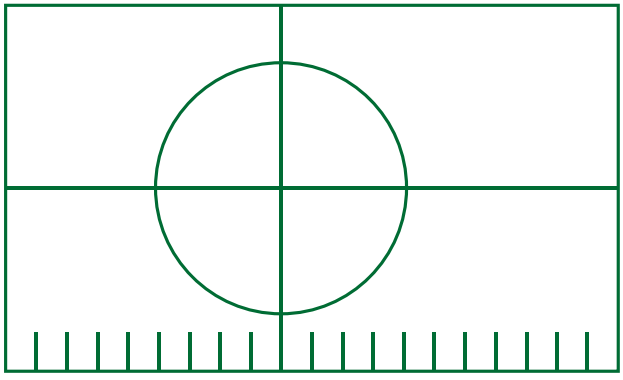

দৈর্ঘ্য ও প্রস্থের অনুপাত ১০ : ৬। অর্থাৎ যদি দৈর্ঘ্য ৩০৫ সেমি (১০ ফুট) হয়, প্রস্থ ১৮৩ সেমি (৬ ফুট) হবে। লাল বৃত্তটির ব্যাসার্ধ পতাকার দৈর্ঘ্যের পাঁচ ভাগের এক ভাগ। পতাকার দৈর্ঘ্যের ২০ ভাগের ৯ ভাগে একটি লম্ব (খাড়া সরলরেখা) টানতে হবে। তারপর প্রস্থের ঠিক অর্ধেক ভাগে দৈর্ঘ্যের সঙ্গে সমান্তরাল করে আরেকটি রেখা টানতে হবে। এই দুটি রেখার ছেদবিন্দুই হবে বৃত্তটির কেন্দ্রবিন্দু।

পতাকার মাপ

(ভবনের আকার ও আয়তন অনুযায়ী)

৩০৫ সেমি x ১৮৩ সেমি (১০' x ৬')

১৫২ সেমি x ৯১ সেমি (৫' x ৩')

৭৬ সেমি x ৪৬ সেমি ($২\frac{১}{২}$' x $১\frac{১}{২}$')

জাতীয় সংগীত

আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি।
চিরদিন তোমার আকাশ, তোমার বাতাস, আমার প্রাণে বাজায় বাঁশি ॥
ও মা, ফাগুনে তোর আমের বনে ঘ্রাণে পাগল করে,
মরি হায়, হায় রে –
ও মা, অঘ্রানে তোর ভরা ক্ষেতে আমি কী দেখেছি মধুর হাসি ॥

কী শোভা, কী ছায়া গো, কী স্নেহ, কী মায়া গো –
কী আঁচল বিছায়েছ বটের মূলে, নদীর কূলে কূলে।
মা, তোর মুখের বাণী আমার কানে লাগে সুধার মতো,
মরি হায়, হায় রে –
মা, তোর বদনখানি মলিন হলে, ও মা, আমি নয়নজলে ভাসি ॥

– রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

গাওয়ার জন্য জাতীয় সংগীতের পূর্ণপাঠ

আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি।
চিরদিন তোমার আকাশ,
চিরদিন তোমার আকাশ, তোমার বাতাস,
আমার প্রাণে
ও মা, আমার প্রাণে বাজায় বাঁশি,
সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি ॥
ও মা, ফাগুনে তোর আমের বনে ঘ্রাণে পাগল করে,
মরি হায়, হায় রে –
ও মা, ফাগুনে তোর আমের বনে ঘ্রাণে পাগল করে,
ও মা, অঘ্রানে তোর ভরা ক্ষেতে কী দেখেছি
আমি কী দেখেছি মধুর হাসি।
সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি ॥
কী শোভা, কী ছায়া গো, কী স্নেহ, কী মায়া গো –
কী আঁচল বিছায়েছ বটের মূলে, নদীর কূলে কূলে।
মা, তোর মুখের বাণী আমার কানে লাগে সুধার মতো,
মরি হায়, হায় রে –
মা, তোর মুখের বাণী আমার কানে লাগে সুধার মতো,
মা, তোর বদনখানি মলিন হলে, আমি নয়ন
ও মা, আমি নয়নজলে ভাসি ॥
সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি ॥

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক ২০২৬ শিক্ষাবর্ষ থেকে চতুর্থ শ্রেণির পাঠ্যপুস্তকরূপে নির্ধারিত

আমার বাংলা বই

ইবতেদায়ি

চতুর্থ শ্রেণি

(পরীক্ষামূলক সংস্করণ)

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ
৬৯-৭০, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা ১০০০
কর্তৃক প্রকাশিত

(প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত)

প্রথম মুদ্রণ: সেপ্টেম্বর, ২০২৫

রচনা, সংকলন ও সম্পাদনা
অধ্যাপক ড. শোয়াইব জিবরান
অধ্যাপক ড. তারিক মনজুর
মোহাম্মদ আহসান ইবনে মাসুদ
মোঃ হারুন অর রশিদ
শুভাশিস চক্রবর্ত্তী
আনজু আনোয়ারা পারভীন
পারভীন সিকদার পিনু
সাইফা সুলতানা

শিল্প নির্দেশনা
হাশেম খান

ছবি ও অলংকরণ
উজ্জয়িনী উৎসা
জয়ন্ত সরকার জন

গ্রাফিক ডিজাইন
মোঃ আব্দুর রাজ্জাক

ডিজাইন
জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য

মুদ্রণে:

প্রসঙ্গকথা

জাতীয় জীবনে ইবতেদায়ি শিক্ষা অত্যধিক গুরুত্বপূর্ণ। মানসম্পন্ন প্রাথমিক শিক্ষাগ্রহণের জন্য জাতিসত্তা, আর্থ-সামাজিক অবস্থা, শারীরিক-মানসিক সীমাবদ্ধতা এবং ভৌগোলিক অবস্থান নির্বিশেষে দেশের সকল শিশুর জন্য সমান সুযোগ সৃষ্টি করা হয়েছে। ইবতেদায়ি শিক্ষার অন্যতম লক্ষ্য হচ্ছে মানবিক মূল্যবোধের বিকাশ এবং দেশজ আবহ ও উপাদানভিত্তিক শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক অনুসরণ করা এবং বিদ্যালয়ে আনন্দময় অনুকূল পরিবেশ তৈরি করে শিশুদের শারীরিক ও মানসিক বিকাশের ব্যবস্থা করা। ২০১০ সালের জাতীয় শিক্ষানীতিতে ইবতেদায়ি স্তরকে বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে। বিশ্বের উন্নত দেশসমূহের সাথে সংগতি রেখে ইবতেদায়ি স্তরের পরিসর বৃদ্ধি এবং শিক্ষাকে অন্তর্ভুক্তিমূলক করার ওপর জোর প্রদান করা হয়েছে।

ইবতেদায়ি শিক্ষাকে যুগোপযোগী করার লক্ষ্যে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড (এনসিটিবি) একটি সমন্বিত শিক্ষাক্রম গ্রহণ করেছে। এই শিক্ষাক্রমে একদিকে শিক্ষাবিজ্ঞান ও উন্নত বিশ্বের শিক্ষাক্রম অনুসরণ করা হয়েছে, অন্যদিকে বাংলাদেশের চিরায়ত শিখন-শেখানো মূল্যবোধকেও গ্রহণ করা হয়েছে। এর মাধ্যমে শিক্ষাকে অধিকতর জীবনমুখী ও ফলপ্রসূ করার প্রয়াস বাস্তব ভিত্তি পেয়েছে। বিশ্বায়নের বাস্তবতায় শিশুদের মনোজাগতিক অবস্থাকেও শিক্ষাক্রমে বিশেষভাবে বিবেচনায় রাখা হয়েছে। অংশীজনের চাহিদা এবং মতামতের পরিপ্রেক্ষিতে পরিবর্তিত প্রেক্ষাপটে সর্বশেষ ২০২৫ সালে জাতীয় শিক্ষাক্রম ২০২১ (প্রাথমিক স্তর)-এর প্রয়োজনীয় পরিমার্জন করা হয়েছে। জাতীয় শিক্ষাক্রম ২০২১ প্রাথমিক স্তর (পরিমার্জিত ২০২৫)-এর আলোকে প্রথম থেকে তৃতীয় শ্রেণির পাঠ্যপুস্তকসমূহ ইতোমধ্যে পরিমার্জন করা হয়েছে। জাতীয় শিক্ষাক্রম ২০২১ প্রাথমিক স্তর (পরিমার্জিত ২০২৫)-এর আলোকে চতুর্থ শ্রেণির পাঠ্যপুস্তকটি প্রণয়ন করা হয়েছে।

শিক্ষাক্রম বাস্তবায়নের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হচ্ছে পাঠ্যপুস্তক। এই বিষয়টিকে প্রাধান্য দিয়ে এনসিটিবি ইবতেদায়ি স্তরসহ প্রতিটি স্তর ও শ্রেণির পাঠ্যপুস্তক প্রণয়নে সর্বদা সচেষ্ট রয়েছে। প্রতিটি পাঠ্যপুস্তক রচনা ও সম্পাদনার ক্ষেত্রে শিক্ষাক্রমের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। শিশুমনের বিচিত্র কৌতূহল এবং ধারণক্ষমতা সম্পর্কে সজাগ দৃষ্টি রাখা হয়েছে। শিখন-শেখানো কার্যক্রম যাতে একমুখী ও ক্লান্তিকর না হয়ে আনন্দের অনুষঙ্গ হয়ে ওঠে সেদিকটি শিক্ষাক্রম এবং পাঠ্যপুস্তক প্রণয়নে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। আশা করা যায়, প্রতিটি পাঠ্যপুস্তক শিশুদের দেহ ও মনের সুষম বিকাশে সহায়ক হবে। একই সাথে তাদের কাঙ্ক্ষিত দক্ষতা, অভিযোজন সক্ষমতা, দেশপ্রেম ও নৈতিক মূল্যবোধ অর্জনের পথকেও সুগম করবে।

চতুর্থ শ্রেণির 'আমার বাংলা বই' পাঠ্যপুস্তকটি প্রণয়নের সময়ে পূর্ব-শ্রেণির ধারাবাহিকতা বজায় রাখা হয়েছে। চতুর্থ শ্রেণিতে সাধারণত নয় বছরের অধিক বয়সের শিশুরা পাঠ গ্রহণ করে। বয়সের কথা বিবেচনায় রেখে শিক্ষাক্রম অনুসারে পাঠ্যপুস্তকে শিখন বিষয়ের উল্লম্ব ও আনুভূমিক বিন্যাস ঘটানো হয়েছে। প্রথম থেকে চতুর্থ শ্রেণির পাঠ্যপুস্তক প্রণয়নের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর আবশ্যকীয় জ্ঞান, বিষয়ভিত্তিক দক্ষতা, দৃষ্টিভঙ্গি এবং মূল্যবোধ অর্জনের মাধ্যমে মৌলিক শিখন চাহিদা পূরণে যেন সক্ষম হয়, সে চেষ্টা করা হয়েছে। চারটি শ্রেণির পাঠ্যপুস্তকেই তথ্য ও বর্ণনামূলক রচনাগুলোর ধারাবাহিকতা রয়েছে।

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের প্রাথমিক শিক্ষাক্রম উইংয়ের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে পাঠ্যপুস্তকটি প্রণয়ন ও পরিমার্জন করা হয়েছে। পাঠ্যপুস্তকটি প্রণয়ন, যৌক্তিক মূল্যায়ন, চূড়ান্তকরণ এবং সমন্বয় কাজের বিভিন্ন পর্যায়ে শ্রেণিশিক্ষক, শিক্ষক প্রশিক্ষক, শিক্ষণ বিশেষজ্ঞ, শিক্ষাক্রম বিশেষজ্ঞ, বিষয় বিশেষজ্ঞ, চিত্রশিল্পী এবং ইনডিজাইনারসহ যাঁরা মেধা এবং শ্রম দিয়েছেন তাঁদের সকলকে জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা। পাঠ্যপুস্তকটি ত্রুটিমুক্তকরণে সংশ্লিষ্ট সকলের সুচিন্তিত মতামত ও পরামর্শ সাদরে গৃহীত হবে।

সেপ্টেম্বর ২০২৫

প্রফেসর রবিউল কবীর চৌধুরী
চেয়ারম্যান (অতিরিক্ত দায়িত্ব)
জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

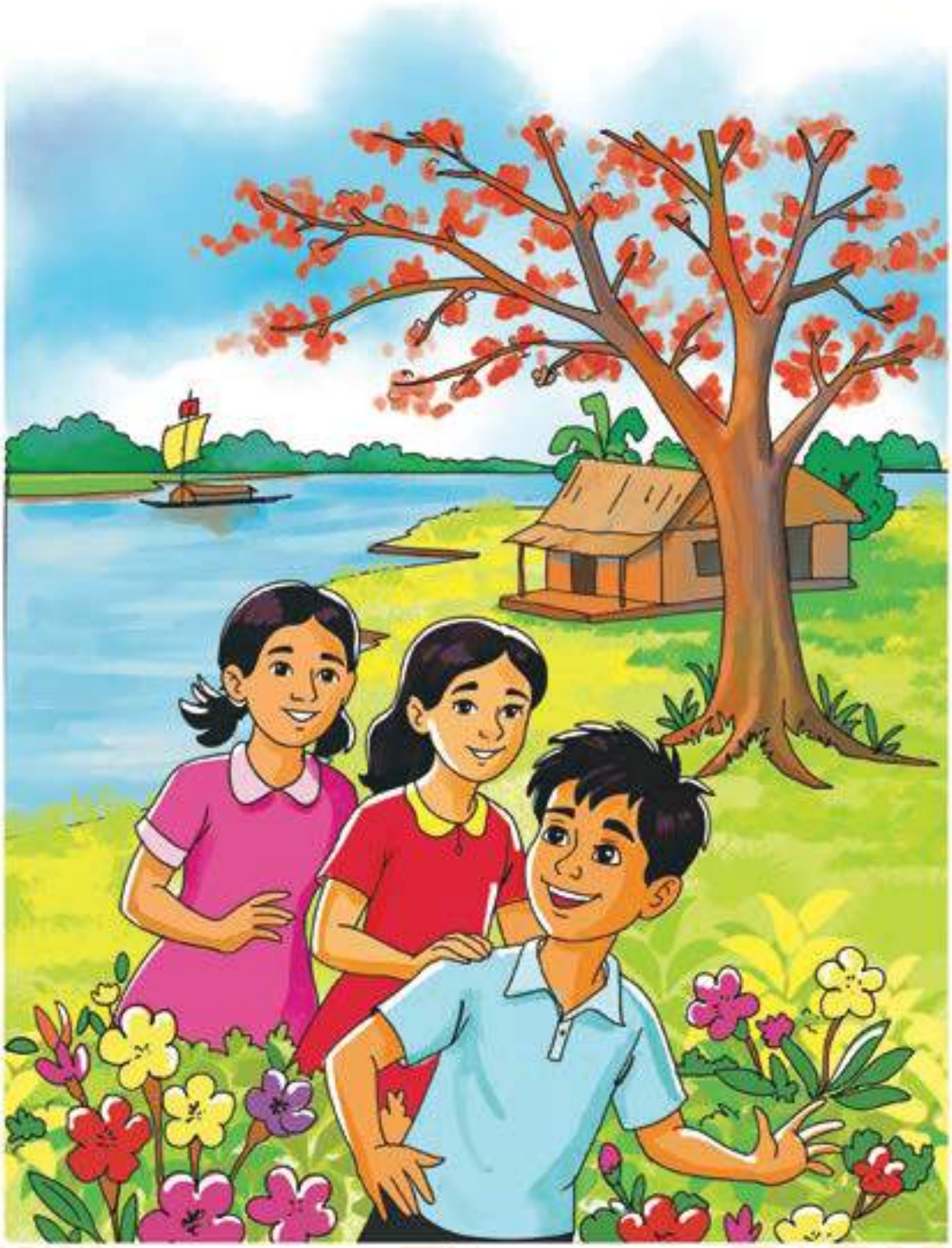

সূচিপত্র

পাঠ	পাঠের শিরোনাম	পৃষ্ঠা
১	রূপময় বাংলাদেশ	১
২	কেমন বড়াই	৭
৩	শুভেচ্ছা জানাই	১১
৪	ভাষার খেলা	১৬
৫	জন্মেছি এই দেশে	২২
৬	দোয়েল পাখি	২৭
৭	একুশের কবিতা	৩৪
৮	চিল ও বিড়াল	৩৮
৯	বৃষ্টির ছড়া	৪৪
১০	ময়নামতি	৪৮
১১	বাঘখেকো শিয়ালের ছানা	৫৬
১২	কাজলা দিদি	৬৩
১৩	দানবীর মুহসিন	৬৮
১৪	অমল ও দইওয়ালা	৭৩
১৫	প্রিয় স্বাধীনতা	৭৯
১৬	সোনার থালা	৮৩
১৭	লিচু-চোর	৮৯
১৮	মহীয়সী নারী	৯৪
১৯	লাল জামা	৯৯
২০	চারদিকে দেখি	১০৪
২১	ভয় পেয়ো না	১০৯
২২	খলিফা উমর (রা)	১১৩
২৩	পাঠাগারের সদস্য হই	১২০

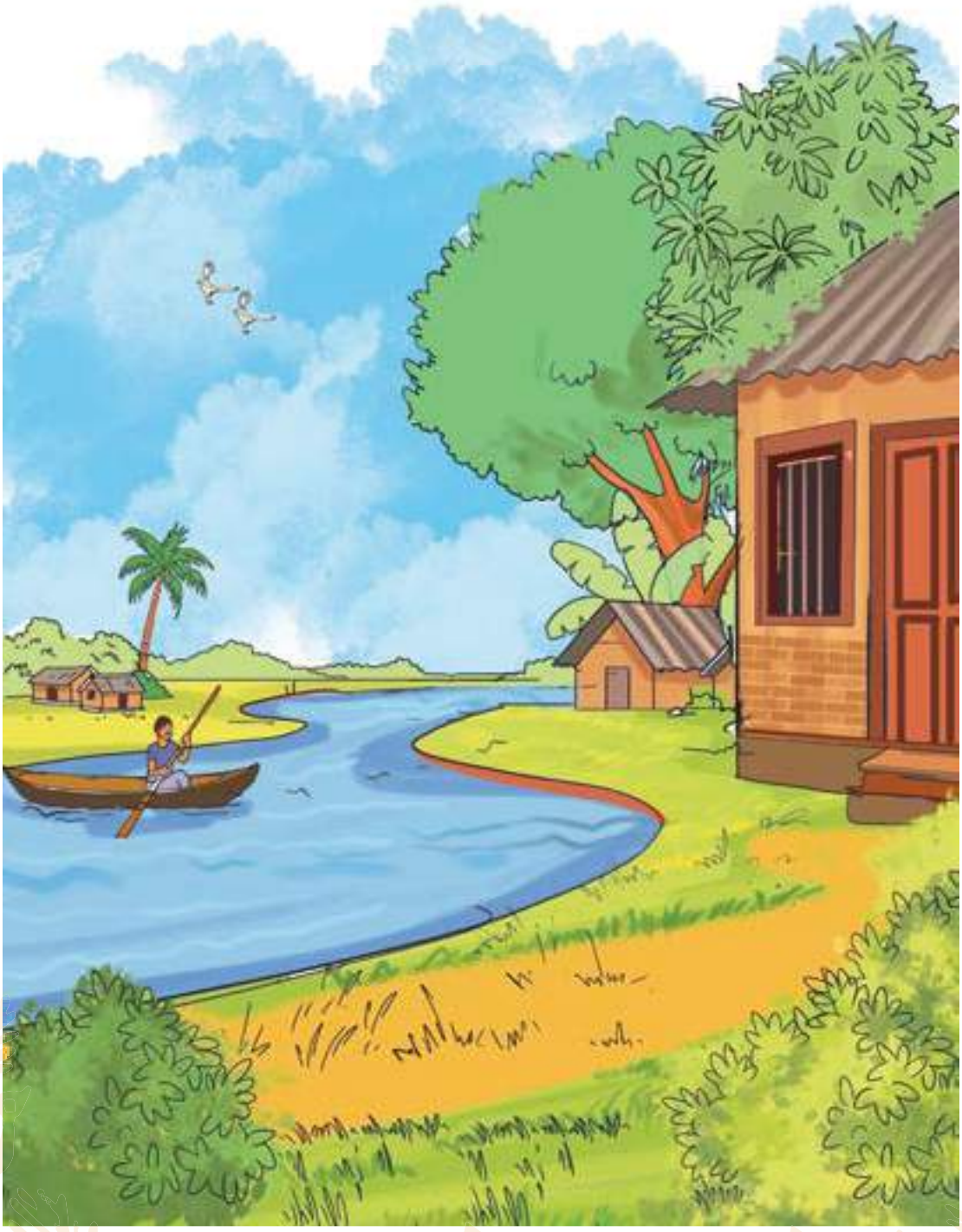

পাঠ ১

রূপময় বাংলাদেশ

কত সুন্দর আমাদের এই বাংলাদেশ! কত সুন্দর এ দেশের প্রকৃতি!

এ দেশের চারদিকে সবুজের সমারোহ। সবুজ গাছপালা, ফসলের খেত। গাছে গাছে কত রঙের ফুল, কত রকম ফল। এ দেশের প্রকৃতি একেক সময়ে একেক রূপে সাজে।

গ্রীষ্মে মাঠঘাট ফেটে চৌচির হয়ে যায়। এ সময়ে পাওয়া যায় আম, জাম, কাঁঠাল, লিচু। বর্ষায় নদীনালা পানিতে ভরে যায়। এ সময়ে ফোটে কদম, কেয়া, দোলনচাঁপা। শরতের আকাশে সাদা মেঘ তুলোর মতো ভেসে বেড়ায়। এ সময়ে নদীর তীরে সাদা কাশফুল দেখা যায়। এরপর হেমন্তে ধান পাকে। সোনালি ধানে মাঠ ভরে যায়। শীতকালে উত্তুরে ঠান্ডা হাওয়া বয়। গাছের পাতা

ঝরে। এরপর শিমুল, পলাশ, কৃষ্ণচূড়া ফুল নিয়ে আসে বসন্ত। কোকিল কুহু কুহু ডাকে। এভাবে ছয়টি ঋতু একের পর এক আসতে থাকে।

বাংলাদেশের প্রকৃতির আরেক সৌন্দর্য এর নদী। অসংখ্য ছোটো-বড়ো নদী রয়েছে এ দেশে। সেগুলো জালের মতো ছড়িয়ে আছে। পদ্মা, মেঘনা, যমুনা বড়ো তিনটি নদী। এ দেশের নদী-খাল-বিলে পাওয়া যায় নানা জাতের মাছ। যেমন: রুই, কাতলা, টেংরা, পুঁটি, খলসে।

এ দেশে আছে বন-জঙ্গল। সেখানে আছে নানা জাতের গাছ, পশু, পাখি। বাংলাদেশের সুন্দরবন পৃথিবী জুড়ে বিখ্যাত। এই বনে আছে সুন্দরী, গেওয়া, গরান, কেওড়া, গোলপাতা গাছ। সেখানে আছে বাঘ, হরিণ, কুমির। আরও আছে মাছরাঙা, মৌটুসি, মদনটাক প্রভৃতি পাখি।

এ দেশের বেশিরভাগ এলাকা সমতল। তবে কোনো কোনো জায়গা পাহাড়ি। পাহাড়েও নানা জাতের গাছ, পশু, পাখি দেখা যায়। রাঙামাটি, বান্দরবান, খাগড়াছড়ি পাহাড়ি এলাকা। এছাড়া ময়মনসিংহ ও সিলেট অঞ্চলে ছোটো-বড়ো পাহাড় আছে।

বাংলাদেশের দক্ষিণে আছে বঙ্গোপসাগর। এর মোহনায় ইলিশের আবাস। সাগরে আছে রূপচাঁদা, রিঠা, লইট্টাসহ হরেক রকম মাছ।

সবুজ প্রকৃতি এ দেশকে করেছে সুন্দর। সেই সৌন্দর্যে বৈচিত্র্য এনেছে নদী, পাহাড়, বন, সাগর।

অর্থ জেনে নিই

উত্তুরে — উত্তর দিক থেকে আসা।

চৌচির — খণ্ড-বিখণ্ড।

মোহনা — নদী যেখানে সাগর বা অন্য নদীর সাথে মেশে।

অনুশীলনী

১. বর্ণ বসিয়ে শব্দ তৈরি করি।

প্রকৃ.....	দোল..... চাঁপা	..... নালি	জ..... ল	রাঙা..... টি	..... পচাঁদা

২. শব্দ নিয়ে খালি ঘর পূরণ করি।

বসন্ত	নদীনালা	বিখ্যাত	দক্ষিণে	সমারোহ

ক. এ দেশের চারদিকে সবুজের .....।

খ. বর্ষায় ..... পানিতে ভরে যায়।

গ. বাংলাদেশের সুন্দরবন পৃথিবী জুড়ে .....।

ঘ. বাংলাদেশের ..... আছে বঙ্গোপসাগর।

ঙ. কৃষ্ণচূড়া ফুল নিয়ে আসে .....।

৩. পাঠ থেকে প্রশ্ন বানাই।

কে? কুহু কুহু কে ডাকে?

কী? .....

কেন? .....

কখন? .....

কোথায়? .....

কেমন? .....

৪. ছবি দেখে বিবরণ লিখি।

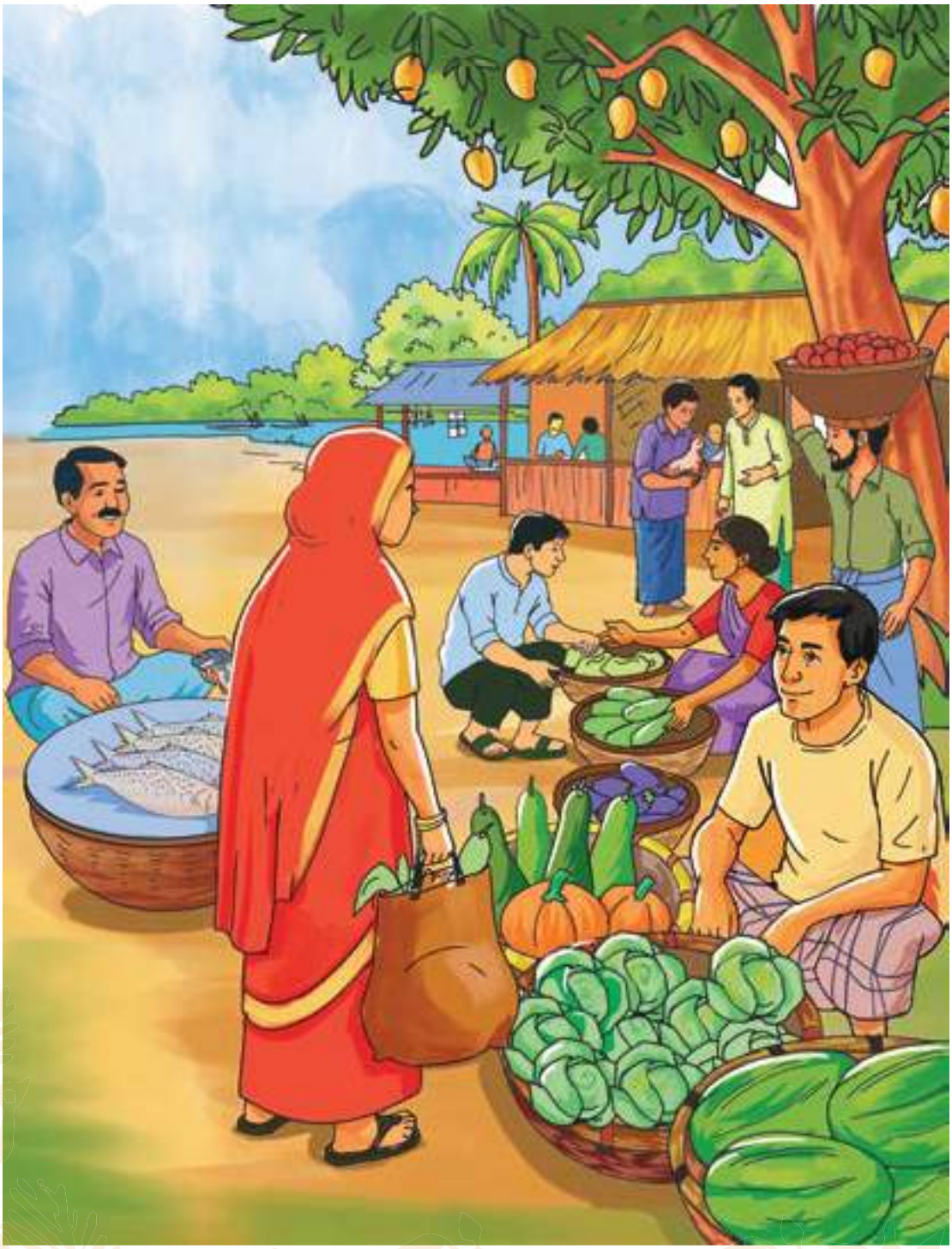

ছবির বিবরণ: .....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

৫. পছন্দের ঋতুর নাম লিখি এবং পছন্দ করার কারণ লিখি।

পছন্দের ঋতু: .....

পছন্দের কারণ: .....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

পাঠ ২

কেমন বড়াই

হাবীবুর রহমান

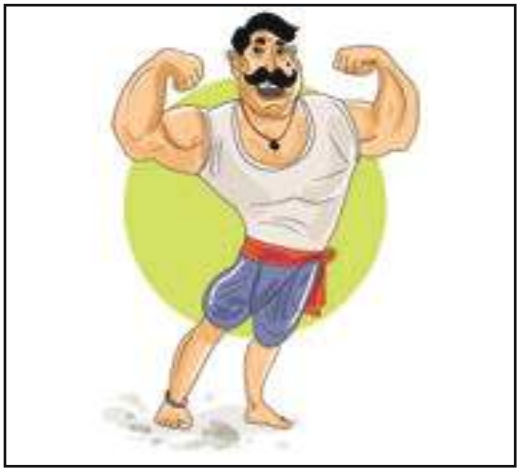

লোকটা শুধু করত বড়াই—
‘দেখে নিতাম লাগলে লড়াই!’

উইঢিবিতে মারত ঘুসি
চোখ পাকিয়ে জোরসে ঠুসি।

বাহু ঠুকে ফুলিয়ে ছাতি
বলত, ‘আসুক বাঘ কি হাতি!

আমি কি আর কারেও ডরাই?
ভাঙতে পারি লোহার কড়াই।’

শুনে সবে কাঁপত ডরে,
খিল লাগিয়ে থাকত ঘরে।

একদিন এক ভোরের বেলায়
বেবাক লোকের ঘুম ভেঙে যায়,

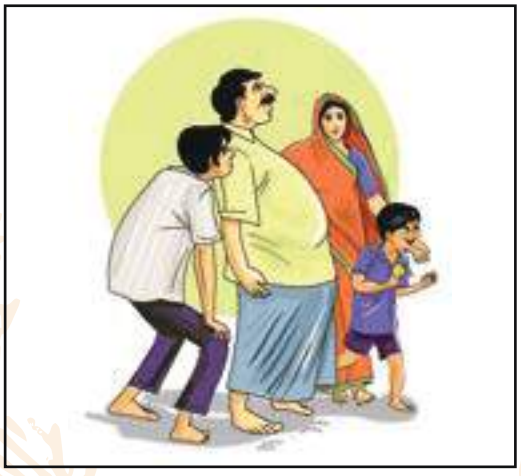

ঘর ছেড়ে সব বাইরে এসে
বাড়িয়ে গলা দেখল শেষে;

ঢিবির পাশে বাঁধের গোড়ায়,
লোকটা কেবল গড়িয়ে বেড়ায়।

‘ব্যাপার কী ভাই, ব্যাপার কী ভাই’—
ফিসফিসিয়ে বলল সবাই।

লোকটা তখন চেঁচিয়ে জানায়—
‘উই ধরেছে নাকের ডগায়!’

অনুশীলনী

১. ছড়াটি সবাই একসাথে আবৃত্তি করি।

লোকটা শুধু করত বড়াই—
‘দেখে নিতাম লাগলে লড়াই!’

উইঢিবিতে মারত ঘুসি
চোখ পাকিয়ে জোরসে ঠুসি।

বাহু ঠুকে ফুলিয়ে ছাতি
বলত, ‘আসুক বাঘ কি হাতি!

আমি কি আর কারেও ডরাই?
ভাঙতে পারি লোহার কড়াই।’

শুনে সবে কাঁপত ডরে,
খিল লাগিয়ে থাকত ঘরে।

একদিন এক ভোরের বেলায়
বেবাক লোকের ঘুম ভেঙে যায়,

ঘর ছেড়ে সব বাইরে এসে
বাড়িয়ে গলা দেখল শেষে;

ঢিবির পাশে বাঁধের গোড়ায়,
লোকটা কেবল গড়িয়ে বেড়ায়।

‘ব্যাপার কী ভাই, ব্যাপার কী ভাই’—
ফিসফিসিয়ে বলল সবাই।

লোকটা তখন চেঁচিয়ে জানায়—
‘উই ধরেছে নাকের ডগায়!’

পাঠ ৩

শুভেচ্ছা জানাই

স্কুলের টিফিনের সময়। রাশেদ, ঝিমিত, ঐশী আর তিথি কথা বলছিল। এমন সময়ে রোশান এসে বলল, ‘জানো, আজ মিতুর জন্মদিন!’

শুনে ঐশী বলল, ‘তাই নাকি? তাহলে তো কিছু একটা করতে হয়।’

ঝিমিত বলল, ‘কিন্তু কীভাবে? এর পরে তো খুশি আপার ক্লাস।’

জন্মদিন। কিছু একটা করতে হবে। কী করা যায়? এটা নিয়ে কথা বলতে বলতে ক্লাসের ঘণ্টা বাজল।

খুশি আপা একটা ব্যাগ নিয়ে ক্লাসে ঢুকলেন। বললেন, ‘আজ আমরা মজার একটা কাজ করব। শুভেচ্ছা কার্ড বানাব।’

তিথি দাঁড়িয়ে বলল, ‘শুভেচ্ছা কার্ড কী, আপা?’

আপা বললেন, ‘শুভেচ্ছা কার্ড এক ধরনের নকশা করা কার্ড। এ ধরনের কার্ড নানা আকারের হয়। মোটা কাগজ দিয়ে শুভেচ্ছা কার্ড বানানো যায়। শুভেচ্ছা কার্ড কিনতেও পাওয়া যায়।’

রোশান বলল, ‘আপা, শুভেচ্ছা কার্ড দিয়ে কী করা হয়?’

আপা বললেন, ‘বিশেষ দিনে শুভকামনা জানিয়ে এ রকম কার্ড দেওয়া হয়। নববর্ষ, ঈদ কিংবা কারো জন্মদিনে শুভেচ্ছা কার্ড দেওয়া হয়।’

তিথি ফিসফিস করে ঐশীকে বলল, ‘মিতুর জন্মদিন উপলক্ষ্যে আমরা শুভেচ্ছা কার্ড দিতে পারি।’ ঐশী মাথা ঝাঁকিয়ে সায় দিলো।

খুশি আপা বললেন, ‘কার্ড বানাতে কয়েকটা জিনিস লাগবে। মোটা কাগজ, রঙিন কাগজ, কাঁচি, রঙিন কলম আর আঠা। এগুলো আমি নিয়ে এসেছি।’

তারপর তিনি সবাইকে কয়েকটি দলে ভাগ করে দিলেন। বললেন, ‘অনেকভাবেই শুভেচ্ছা কার্ড বানানো যায়। আমি একটা উপায় বলি। কাজের ধাপগুলো খেয়াল করো।’

বড়ো মোটা কাগজ থেকে একটা অংশ কেটে নেব। এটাই হবে শুভেচ্ছা কার্ড। এই কার্ড গোল, লম্বা যেকোনো আকারের হতে পারে।

পাতলা রঙিন কাগজ কেটে ফুল, লতা, পাতা বানাব। সেগুলো শুভেচ্ছা কার্ডের চারদিকে আঠা দিয়ে লাগাব। তবে রঙিন কলম দিয়ে আঁকলেও হবে।

কার্ডের মাঝখানে লেখার জন্য জায়গা থাকবে। সেখানে শুভেচ্ছা জানিয়ে কিছু কথা লিখব। অল্প কথায় শুভেচ্ছা জানাতে হয়।

এরপর খুশি আপা কাগজ, কাঁচি ইত্যাদি দিলেন। প্রতিটি দল কার্ড বানানো শুরু করল।

কিন্তু মুশকিল হলো কার্ডের লেখা নিয়ে। শুভেচ্ছা কার্ডে কী লেখা যায়? খুশি আপা বললেন, 'বিশেষ দিন, ঘটনা বা উৎসবে কার্ড দেওয়া হয়। তাই উপলক্ষ্য অনুযায়ী কার্ডে কথা লেখা যায়।' এরপর তিনি বোর্ডে কয়েকটি নমুনা লিখলেন–

তোমাকে জন্মদিনের শুভেচ্ছা	বিতর্ক প্রতিযোগিতায় পুরস্কার পাওয়ায় তোমাকে অভিনন্দন

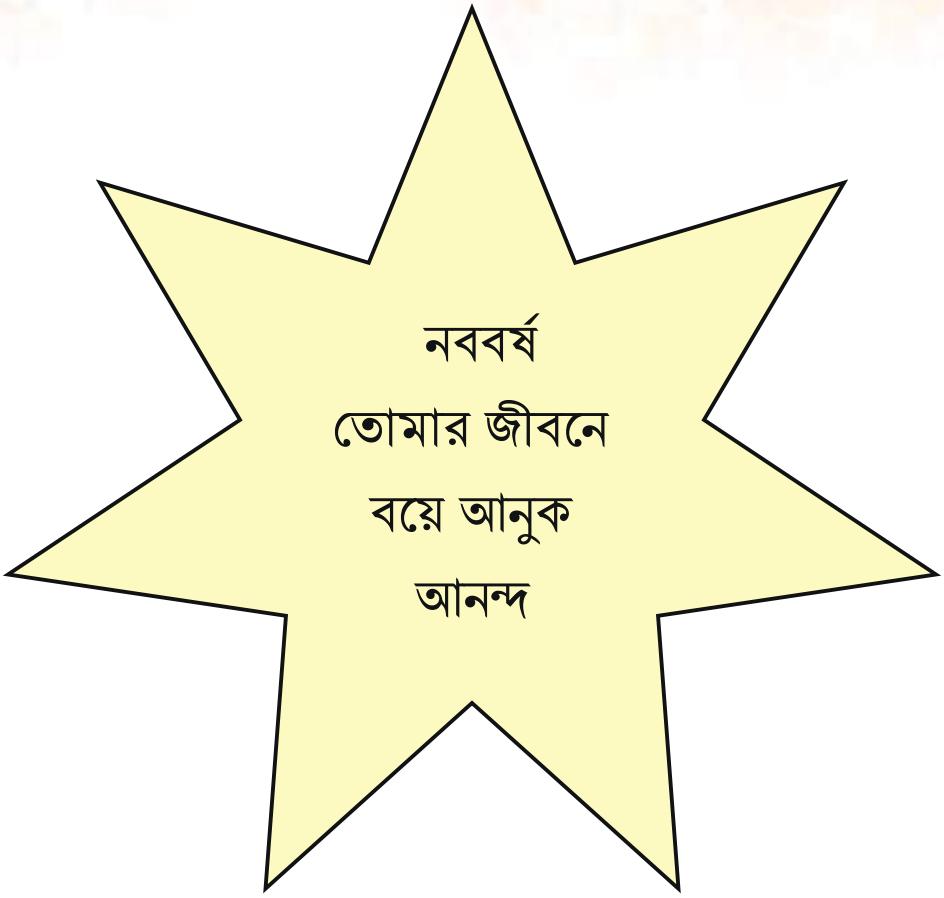

সব দলের কার্ড বানানো হয়ে গেল। খুশি আপা কয়েকটা কার্ড দেখে অবাক হয়ে গেলেন। একটাতে লেখা ‘মিতুকে জন্মদিনের শুভেচ্ছা’। অন্য একটাতে লেখা ‘মিতুর সামনের দিনগুলো আরও সুন্দর হোক’।

আপা মিতুর দিকে তাকালেন। বললেন, ‘আজ কি তোমার জন্মদিন?’

মিতু লাজুক ভঙ্গিতে বলল, ‘হ্যাঁ।’

আপা বললেন, ‘আমরা কার্ড দিয়ে শুভেচ্ছা জানাতে পারি। আবার মুখে সুন্দর করে বলেও শুভেচ্ছা জানাতে পারি। এসো, সবাই মিলে মিতুকে শুভ জন্মদিন বলি।’

তারপর সবাই একসাথে বলল, ‘শুভ জন্মদিন, মিতু!’

অনুশীলনী

১. প্রশ্নের উত্তর লিখি।

ক. শুভেচ্ছা কী?

খ. আমরা কেন অন্যকে শুভেচ্ছা জানাই?

গ. শুভেচ্ছা কার্ড তৈরি করতে কী কী জিনিসের প্রয়োজন হয়?

২. শুভেচ্ছা কার্ড তৈরি করি ও লিখি।

উপলক্ষ্য	শুভেচ্ছা কার্ডে যা লিখতে পারি
ছোটো ভাইয়ের জন্মদিন	
ঈদ/ পূজা/ বড়োদিন/ বুদ্ধপূর্ণিমা	
বাংলা নববর্ষ	
মায়ের জন্মদিন	
বিজয় দিবস	

পাঠ ৪

ভাষার খেলা

১. বর্ণের দ্বিধা দূর করি।

কিছু কিছু বর্ণ ও যুক্তবর্ণে মিল আছে। এগুলো দেখতে কাছাকাছি হলেও আসলে এক নয়।

এ	ত্র	ক্র
ও	ত্ত	ক্ত
হু	হৃ	হ্ন
হ্ম	ক্ষ	ক্ষ্ম

উপরের বর্ণ ব্যবহার করে শব্দ লিখি। যেমন: একতারা, শত্রু, ক্রয়।

....

....

....

....

২. ইন্দ্রিয়ের সাথে সম্পর্ক বুঝি।

আমাদের প্রধান ইন্দ্রিয় পাঁচটি। নিচের শব্দগুলোর কোনটির সাথে কোন কোন ইন্দ্রিয়ের সম্পর্ক গোল দাগ দিয়ে দেখাই।

ফুল	:	চোখ	কান	নাক	জিভ	ত্বক
ফল	:	চোখ	কান	নাক	জিভ	ত্বক

দই : চোখ কান নাক জিভ ত্বক

তালা : চোখ কান নাক জিভ ত্বক

শিশির : চোখ কান নাক জিভ ত্বক

আবর্জনা : চোখ কান নাক জিভ ত্বক

৩. দুই রকম শব্দ লিখি।

একটি বর্ণ দিয়ে দুটি করে শব্দ লিখি। একটি দেখা যায়, অন্যটি দেখা যায় না।

বর্ণ	দেখা যায়	দেখা যায় না
অ	অজগর	অনেক
আ		
ক		
ছ		
ন		
ব		

৪. যত পারি শব্দ বানাই।

তিনটি করে ব্যঞ্জনবর্ণ দেওয়া আছে। এসব বর্ণ দিয়ে যত পারি শব্দ বানাই।

ম ল ক: কাক, কলম, কলা, কল, মা, মেলা, লোম, লাল, মৌলিক।

ল ত ব: .....

প ক ত: .....

ব র ট: .....

ক থ ল: .....

আ ম ড়: .....

৫. শব্দ ভাঙি।

মন্দ =

মুগ্ধ =

বজ্র =

গর্বিত =

পতঙ্গ =

মিষ্টি =

৬. নাম-শব্দের সাথে কাজ-শব্দ যোগ করি।

নিচে একটি করে নাম-শব্দ দেওয়া আছে। এগুলোর পাশে একটি কাজ-শব্দ লিখি এবং বাক্য তৈরি করি।

নাম-শব্দ	কাজ-শব্দ	বাক্য তৈরি
জামা	পরা	নতুন জামা পরে চলো ঈদগায় যাই।
ছবি	.....	.....
ঘুড়ি	.....	.....
বই	.....	.....
ঘর	.....	.....

৭. বাক্য বানাই।

ছক থেকে শব্দ নিয়ে বাক্য বানাই।

আমি		খেলি
আমরা		খাই
তুমি	বল	খেলো
তোমরা	ভাত	খাও
সে		খেলে
তারা		খায়

ক. .....

খ. .....

গ. .....

ঘ. .....

ঙ. .....

চ. .....

৮. নাম-শব্দ বদল করি।

ছক থেকে শব্দ নিয়ে সবুজ রঙের নাম-শব্দগুলো বদল করি।

সেটি	তার	তাকে	সেগুলোর	তিনি

রাসেল আজ স্কুলে আসেনি। রাসেলের জ্বর হয়েছে।

.....

হামিদ স্যার আমাদের প্রধান শিক্ষক। প্রধান শিক্ষক নিয়ম মানা পছন্দ করেন।

.....

পাখিটি উড়ে গেল। পাখিটি কোথায় গেল বুঝতে পারছি না।

.....

মাহিন আমাকে একটা বই উপহার দিয়েছে। আমি মাহিনকে একটা কলম উপহার দিতে চাই।

.....

কয়েকটা হরিণ ঘাস খাচ্ছে। হরিণগুলোর কাছেই একটা খরগোশ দেখলাম।

.....

৯. মিল করি।

বামপাশের শব্দের সাথে ডানপাশের শব্দের মিল করি।

বামপাশ	ডানপাশ
চিকচিক	কাশি
খকখক	লিচু
টসটসে	সাদা
কুচকুচে	বালি
ধবধবে	কালো

১০. ছক পূরণ করি।

নিচের সূত্র দেখে ছকটি পূরণ করি।

১	২		৩	৪
৫			৬	
৭	৮		৯	১০
১১			১২	

পাশাপাশি: ১. একটি ফলের নাম, ৩. শরীরের উপরের একটি অংশ, ৫. কেশ, ৬. গলায় পরার জিনিস, ৭. একটি প্রাণীর নাম, ৯. মাদুর, ১১. ধনুক দিয়ে যা ছোড়া হয়, ১২. চাবি দিয়ে যা খোলা হয়।

উপর-নিচ: ১. এক রকম সবজি, ২. একটি রঙের নাম, ৩. মায়ের ভাই, ৪. ভাত খাওয়ার পাত্র, ৭. যা থেকে আলো পাওয়া যায়, ৮. যেখানে আমরা থাকি, ৯. গাছের ডালে যা থাকে, ১০. ছোটো পাহাড়।

পাঠ ৫

জন্মেছি এই দেশে

সুফিয়া কামাল

অনেক কথার গুঞ্জন শুনি
অনেক গানের সুর
সবচেয়ে ভালো লাগে যে আমার
'মাগো' ডাক সুমধুর।

আমার দেশের মাঠের মাটিতে
কৃষাণ দুপুরবেলা
ক্লান্তি নাশিতে কণ্ঠে যে তার
সুর লয়ে করে খেলা।

মুক্ত আকাশে মুক্ত মনের
সেই গান চলে ভেসে
জন্মেছি মাগো তোমার কোলেতে
মরি যেন এই দেশে।

এই বাংলার আকাশ-বাতাস
এই বাংলার ভাষা
এই বাংলার নদী, গিরি-বনে
বাঁচিয়া মরিতে আশা।

শত সন্তান সাধ করে এর
ধূলি মাখি সারা গায়
বড়ো গৌরবে মাথা উঁচু করি
মানুষ হইতে চায়।

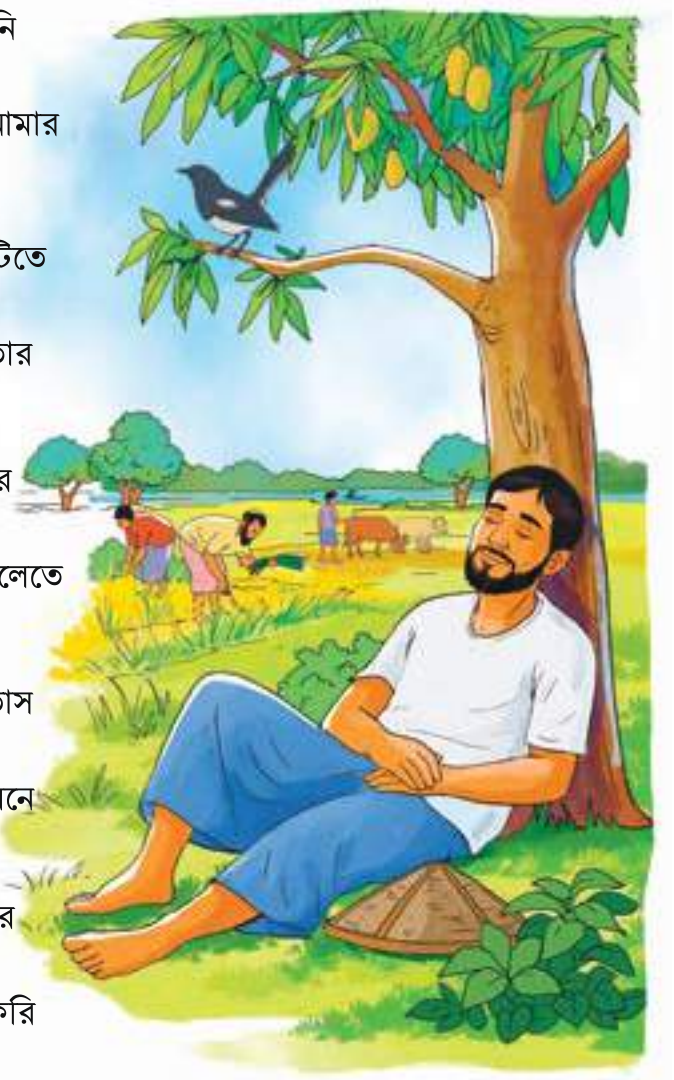

অর্থ জেনে নিই

কৃষাণ — চাষি।

ক্লান্তি নাশিতে — ক্লান্তি দূর করতে।

গিরি — পাহাড়।

গুঞ্জন — গুনগুন আওয়াজ।

গৌরব — সম্মান; গর্ব।

ধূলি — ধুলা।

মুক্ত আকাশ — খোলা আকাশ।

মুক্ত মন — উদার মন।

সাধ — ইচ্ছা।

সুমধুর — অতি মধুর।

কবিতায় যা বলা হয়েছে

এই কবিতায় দেশকে ভালোবাসার কথা বলা হয়েছে। দেশ কবির কাছে মায়ের মতো। এ দেশে কবি জন্মেছেন, এ দেশেই তিনি মরতে চান। দেশের মাটি ও ধুলা গায়ে মেখেই সবাই বড়ো হয়।

অনুশীলনী

১. কবিতা থেকে মিল-শব্দ খুঁজি।

বেলা-খেলা

.....

.....

.....

.....

.....

২. বাক্য লিখি।

গুনগুন .....

চাষি .....

ক্লান্ত .....

সম্মান .....

নদী .....

পথ .....

৩. শব্দ নিয়ে শূন্যস্থান পূরণ করি।

আকাশে	কৃষক	পাহাড়	সম্মান	পরিশ্রান্ত	স্বাধীন

ক. আমরা বড়োদের ..... করব।

খ. শ্রমিক ..... হয়ে বিশ্রাম নিচ্ছে।

গ. ..... মাঠে নানা ধরনের ফসল ফলায়।

ঘ. ..... সাদা মেঘের ভেলা ভেসে বেড়ায়।

ঙ. সিলেটেও ছোটো-বড়ো অনেক ..... আছে।

চ. আমরা ..... দেশের নাগরিক।

৪. প্রশ্নের উত্তর বলি ও লিখি।

ক. ক্লান্তি দূর করতে কৃষক কী করেন?

খ. কবি কেন এ দেশেই মরতে চান?

গ. মা ডাক কেন এত ভালো লাগে?

ঘ. এ দেশের শিশুরা কী হতে চায়?

ঙ. বাংলাদেশের প্রকৃতির কী কী ভালো লাগে?

৫. আগের চরণ লিখি।

.....

কৃষাণ দুপুরবেলা

.....

সুর লয়ে করে খেলা।

.....

সেই গান চলে ভেসে

.....

মরি যেন এই দেশে।

৬. কবিতাটি আবৃত্তি করি।

৭. ব্যাখ্যা বলি ও লিখি।

শত সন্তান সাধ করে এর
ধূলি মাখি সারা গায়
বড়ো গৌরবে মাথা উঁচু করি
মানুষ হইতে চায়।

৮. নাম-শব্দ বাছাই করে ডানপাশের ঘরে লিখি।

শব্দ	নাম-শব্দ
আকাশ, চায়, মধুর, তিনি, বাতাস, সুন্দর, বন, পাহাড়, সে, দেশ, নদী, ভেসে, সন্তান, উঁচু, ধূলি, মানুষ, করি, গৌরব, সাধ, মাথা, তরল, গাছ।	

পাঠ ৬

দোয়েল পাখি

বাংলাদেশের জাতীয় পাখির নাম দোয়েল। দেশের প্রায় সব জায়গায় দোয়েল পাখি দেখা যায়। এরা মানব-বসতির কাছাকাছি থাকতে পছন্দ করে। বিশেষ করে যেসব জায়গায় ফসলের খেত এবং নদী বা জলাশয় আছে।

অন্য সব পাখির মতো দোয়েল পাখিও সুন্দর। এর গায়ের রং কালো বা ধূসর এবং পেটের দিকটা সাদা। দোয়েল ছোটো আকারের পাখি। মাথা থেকে লেজ পর্যন্ত দৈর্ঘ্য প্রায় ৬ থেকে ৭ ইঞ্চি। ওজন ৩০ থেকে ৮০ গ্রাম। চোখের রং কালো। লেজ বেশ লম্বা। বেশিরভাগ সময় লেজ উঁচু হয়ে থাকে।

দোয়েল পাখি গাছের কোটরে ও ঝোপঝাড়ে বাসা বানায়। বেশিরভাগ সময় এদের জোড়ায় থাকতে দেখা যায়। এপ্রিল থেকে জুলাই মাসের মধ্যে স্ত্রী দোয়েল ডিম পাড়ে। সাধারণত তিন থেকে পাঁচটি ডিম পাড়ে। ডিমের রং হালকা নীলচে সবুজ। তার উপর বাদামি ছোপ থাকে। পুরুষ দোয়েল বাসা পাহারা দেয়। স্ত্রী দোয়েল ডিমে তা দেয়। প্রায় দুই সপ্তাহ পরে ডিম ফুটে ছানা বের হয়।

দোয়েল পাখি ১২ থেকে ১৫ বছর পর্যন্ত বাঁচে। এরা সাধারণত পোকামাকড় ও কীটপতঙ্গ খায়। এরা গাছের ডালে ডালে লাফিয়ে বেড়ায়। তখন লেজের ডগা নাচায়। প্রয়োজন না হলে এরা একটানা বেশি দূর ওড়ে না। দোয়েল খুব ভোরে কিংবা বিকালবেলায় মিষ্টি সুরে গান গায়। এদের মিষ্টি মোলায়েম সুর মানুষকে মুগ্ধ করে।

আমাদের আশপাশের অনেক দেশে দোয়েল পাখি আছে। নানা কারণে দিনদিন এই পাখি কমে যাচ্ছে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় জোড়া দোয়েলের ভাস্কর্য রয়েছে। এটি দোয়েল চত্বর নামে পরিচিত।

অর্থ জেনে নিই

কোটর — গাছের গায়ের গর্ত।

ধূসর — ছাই রং।

মানব-বসতি — মানুষ যেখানে বসবাস করে।

ভাস্কর্য — পাথর, ধাতু, কাঠ ইত্যাদি খোদাই করে বানানো শিল্পকর্ম।

অনুশীলনী

১. পাঠ থেকে প্রশ্ন বানাই।

কী? দোয়েল পাখি কী খায়?

কোথায়? .....

কখন? .....

কীভাবে? .....

কেমন? .....

কেন? .....

কোন? .....

কত? .....

২. বন্ধনী থেকে শব্দ নিয়ে খালি জায়গায় লিখি।

ক. পেনসিল ..... কলম দিয়ে লেখো। (এবং/ বা)

খ. এই গাছে দোয়েল ..... কোকিল যেকোনো একটি পাখির বাসা আছে। (এবং/ অথবা)

গ. আজ মালতি ..... সাবিনা কেউই বিদ্যালয়ে আসেনি। (কিংবা/ ও)

ঘ. গাছের ডালে ..... মাটিতে দোয়েল লাফিয়ে বেড়ায়। (অথবা/ ও)

ঙ. চা ..... শরবত কোনটি খাবে? (এবং/ কিংবা)

৩. শব্দ সাজিয়ে বাক্য লিখি।

ক. নাম জাতীয় বাংলাদেশের পাখির দোয়েল।

.....

খ. দেয় পুরুষ পাহারা বাসা দোয়েল।

.....

গ. দোয়েল হয় পাখি ছোটো আকারের।

.....

ঘ. উপকার আমাদের পাখি অনেক করে।

.....

ঙ. বাসা বেশিরভাগ গাছে বানায় পাখি।

.....

চ. গান শুনে জুড়ায় কান পাখির।

.....

৪. বিপরীত শব্দ লিখি।

প্রদত্ত শব্দ	বিপরীত শব্দ
পছন্দ	
সুন্দর	
প্রিয়	
খুশি	
হালকা	
রাত	
দূর	

৫. কোন শব্দটি অন্যগুলোর থেকে আলাদা তা লিখি।

দোয়েল/ গাছ/ বক/ শালিক গাছ

লেজ/ পাখা/ মাথা/ পাতা .....

ফল/ ডানা/ মূল/ ফুল .....

সাদা/ ধূসর/ পাখি/ কালো .....

নদী/ জলাশয়/ পাহাড়/ পুকুর .....

এপ্রিল/ জুলাই/ মে/ ছানা .....

পাখি/ প্রজাপতি/ মাকড়সা/ তেলাপোকা .....

৬. প্রশ্নের উত্তর বলি ও লিখি।

ক. দোয়েল পাখি কোথায় দেখা যায়?

খ. দোয়েল পাখি কেন ফসলের খেতে আসে?

গ. দোয়েল পাখি কখন বাসা বানায়?

ঘ. দোয়েল পাখি কীভাবে মানুষকে মুগ্ধ করে?

ঙ. পাখি কেন দিনে দিনে কমে যাচ্ছে?

চ. পাখির জন্য আমরা কী করতে পারি?

৭. ছক থেকে শব্দ খুঁজে বের করি।

ভ	ডা	ব	ঠ	ল	তা
ম	দো	য়ে	ল	কা	ল
ত	স	গা	ছ	বি	স
পা	বা	ব	না	প	বু
খি	র	ন্য	ছা	তা	জ
শা	লি	ক	রে	কা	ন

....

....

....

....

৮. একটি পাখি নিয়ে রচনা লিখি।

পাখিটির নাম কী?

পাখিটি কোথায় দেখেছ?

পাখিটি দেখতে কেমন?

এরা কেমন করে ডাকে?

এরা কোথায় থাকে?

কী ধরনের খাবার খায়?

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

পাঠ ৭

একুশের কবিতা

আল মাহমুদ

ফেব্রুয়ারির একুশ তারিখ
দুপুরবেলার অক্ত
বৃষ্টি নামে, বৃষ্টি কোথায়?
বরকতের রক্ত।

হাজার যুগের সূর্যতাপে
জ্বলবে, এমন লাল যে,
সেই লোহিতেই লাল হয়েছে
কৃষ্ণচূড়ার ডাল যে!

প্রভাতফেরির মিছিল যাবে
ছড়াও ফুলের বন্যা
বিষাদগীতি গাইছে পথে
তিতুমীরের কন্যা।

চিনতে না কি সোনার ছেলে
ক্ষুদিরামকে চিনতে?
রুদ্ধশ্বাসে প্রাণ দিলো যে
মুক্ত বাতাস কিনতে?

পাহাড়তলীর মরণচূড়ায়
ঝাঁপ দিল যে অগ্নি,
ফেব্রুয়ারির শোকের বসন
পরলো তারই ভগ্নী।

প্রভাতফেরি, প্রভাতফেরি
আমায় নেবে সঙ্গে,
বাংলা আমার বচন, আমি
জন্মেছি এই বঙ্গে।

অর্থ জেনে নিই

অক্ত — সময়।
অগ্নি — আগুন।
প্রভাতফেরি — সকালে খালি পায়ে গান গেয়ে শহিদ মিনারে যাওয়া।
বচন — কথা; ভাষা।
বিষাদগীতি — দুঃখের গান।
ভগ্নী — বোন।
রুদ্ধশ্বাসে — ফাঁসিতে; শ্বাস বন্ধ করে।
লোহিত — লাল রং; সূর্যের লাল রং।

কবিতায় যা বলা হয়েছে

মাতৃভাষার জন্য প্রাণ দিয়েছিল এদেশের মানুষ। ফেব্রুয়ারির ২১ তারিখে তাঁদের স্মরণে অনুষ্ঠিত হয় প্রভাতফেরি। এই কবিতায় কবি একুশে ফেব্রুয়ারিকে স্মরণ করেছেন। প্রভাতফেরিতে হাঁটতে হাঁটতে তাঁর মনে পড়ছে শহিদ বরকতের কথা। মনে হচ্ছে, আকাশ থেকে ঝরে পড়ছে বরকতের রক্ত। সেই রক্তে যেন লাল হয়েছে কৃষ্ণচূড়া ফুল। কবির মনে পড়ছে শহিদ তিতুমীরের কথা। ইংরেজদের সঙ্গে যুদ্ধ করে তিনি শহিদ হয়েছিলেন। প্রভাতফেরির মিছিলে শোকের গান গাইছে যেন সেই তিতুমীরের কন্যা। আবার এই মিছিলেই শরিক হয়েছেন শহিদ ক্ষুদিরাম। তিনিও যুদ্ধ করেছিলেন ইংরেজদের বিরুদ্ধে। এখানে শহিদ বীরদের স্মরণ করা হয়েছে। কবিতায় নিজের দেশ ও ভাষার প্রতি ভালোবাসার কথাও বলা হয়েছে।

অনুশীলনী

১. বর্ণ সাজিয়ে শব্দ লিখি।

ছিলমি চনব রহাজা রুশ্বাদ্ধস

....

চূকৃড়াঞ্চ ভারিপ্রতফে রিব্রুয়াফে পুলাদুরবে

....

২. কবিতা থেকে মিল-শব্দ খুঁজে বের করি।

.....

.....

.....

.....

.....

.....

৩. পরের লাইন লিখি।

প্রভাতফেরির মিছিল যাবে

.....

বৃষ্টি নামে, বৃষ্টি কোথায়?

.....

পাহাড়তলীর মরণচূড়ায়

.....

বাংলা আমার বচন, আমি

.....

৪. শব্দ দিয়ে বাক্য তৈরি করি।

শব্দ	বাক্য
মুক্ত	.....
বন্যা	.....

বৃষ্টি .....

ঝাঁপ .....

প্রভাতফেরি .....

৫. প্রশ্নের উত্তর বলি ও লিখি।

ক. কে মুক্ত বাতাস কিনতে প্রাণ দিয়েছে?

খ. কবি কোথায় জন্মগ্রহণ করেছেন?

গ. কীসের দাবিতে একুশে ফেব্রুয়ারির ঘটনা ঘটেছিল?

ঘ. ফেব্রুয়ারির একুশ তারিখ কী ঘটেছিল?

ঙ. তোমার অভিজ্ঞতা থেকে প্রভাতফেরির বর্ণনা দাও।

৬. বেমানান শব্দটি আলাদা করে পাশে লিখি।

বাবা/ মা/ বন্দি/ বোন .....

মেঘ/ কন্যা/ বৃষ্টি/ বন্যা .....

প্রভাত/ দুপুর/ রাত্রি/ বাতাস .....

বায়না/ আবদার/ অনুরোধ/ ভাবনা .....

প্রাণ/ আগুন/ উত্তাপ/ তাপ .....

৭. কবিতাটি আবৃত্তি করি।

পাঠ ৮

চিল ও বিড়াল

হালিমা খাতুন

এক গাছে ছিল এক চিলের বাসা। খড়কুটো দিয়ে তৈরি বেশ বড়ো একটা বাসা। বাসায় থাকত বাবা-চিল, মা-চিল আর তিনটি বাচ্চা। মা-বাবা সবসময় বাসায় থাকত না। মাঝে মাঝে তারা খাবার আনতে বের হয়ে যেত।

চিলের বাচ্চাগুলো ছিল খুব দুষ্ট। তারা সবসময় মারামারি আর চেঁচামেচি করত। পেটুকও ছিল ওরা খুব। খাওয়ার জন্যও ওরা রাতদিন চিঁ চিঁ করত। বাবা-মা ওদের থামাতে না পেরে কেবল খাবার এনে ওদের খাওয়াত। খাবার যতক্ষণ ওদের মুখে থাকত, ততক্ষণ ওরা চুপ থাকত। খাবার ফুরিয়ে গেলে মারামারি আর চেঁচামেচি শুরু করত।

পাশের গাছে কোকিলের বাসা। কোকিলের বাচ্চারা মার কাছে গান শিখত। চিলের বাচ্চাদের চেঁচামেচিতে তারা অস্থির হয়ে যেত। তারা ঠিকমতো গান শিখতে পারত না। মাঝে মাঝে এসে কোকিল ভাবত চিলদের পাড়া থেকে সে চলেই যাবে। আবার মাঝে মাঝে এসে কোকিল চিলদের বলত বাচ্চাদের চিৎকার থামাতে। চিল বলত, ওদের নিয়ে আর পারি না। সারাক্ষণ তো খাবার এনে দিচ্ছি, তবুও ওরা থামে না।

একদিন চিলেরা বাসায় নেই। এমন সময় একটা দুষ্ট বিড়াল সেখানে এসে হাজির। বাসার দরজা খোলা রেখে মা-চিল অল্প সময়ের জন্য বাইরে গিয়েছিল। দুষ্ট বিড়ালটা বাসায় ঢুকেই চিলের একটা বাচ্চাকে তাড়া করেছে তাকে খাওয়ার জন্য। বাচ্চাটি পড়ি কি মরি করে চেঁচিয়ে উঠেছে। মা-চিল তখুনি বাসায় এসে ঢুকেছে। বাচ্চাকে চেঁচাতে দেখে মা ভাবল বাচ্চা বুঝি খাবার জন্য কাঁদছে। না, ভালো করে তাকিয়ে দেখে কি–একটা বিড়াল বাচ্চাটাকে তাড়া করেছে।

চিল তখন তার বড়ো বড়ো নখ আর ঠোঁট দিয়ে বিড়ালটাকে ধরতে গেল। চিলের সেই চেহারা দেখে বিড়াল ভয়ে দিল এক লাফ। চিলের বাসার নিচে ছিল একটা পুকুর। বিড়াল গিয়ে পড়ল সেই পুকুরের মধ্যে। পুকুরে পড়ে গিয়ে পানি-কাদা খেয়ে বিড়াল ঢোল হয়ে গেল। ওর গা-টা সব ভিজে চুপসে গেল। ও তখন সত্যি একটা ভিজে বিড়াল হয়ে গেল।

চিলের বাচ্চারা আবার চিঁ চিঁ করতে শুরু করল। চিল তখন আবার খাবার খুঁজতে বের হলো। যাওয়ার সময় ঘরের দরজা ভালো করে আটকে দিয়ে বাচ্চাদের বলল, কাউকে বাসায় আসতে দিবি না। কেউ যদি এসে ডাকে বলবি, মা-বাবা বাসায় নেই। আর খবরদার, দরজা খুলবি না।

বাচ্চারা বলল, আচ্ছা।

চিল বাসার বাইরে বের হয়ে গাছের উঁচু ডালে বসে কিছুক্ষণ চারদিক তাকিয়ে দেখল, তারপর ডানা মেলে উড়ে গেল রূপসা নদীর দিকে।

সেই বিড়ালটা পুকুর থেকে কোনো রকমে উঠে এসে ঘাসের মধ্যে রোদে বসে গা শুকাল। আর চেটে চেটে হাত-পা পেট-পিঠ সাফ করল। তারপর? তারপর সে চিলের বাসার দিকে রওনা হলো। চিলের বাচ্চার চেহারাটা সে মোটেই ভুলতে পারছিল না। প্রায় তো বাচ্চাটাকে সে ধরেই ফেলেছিল! অল্পের জন্য হাতছাড়া হয়ে গেল। বাচ্চাটাকে খাওয়ার জন্য তার জিভ থেকে প্রায় টপটপ করে ... আচ্ছা থাক সে কথা।

ঘাসের বন থেকে বের হয়ে বিড়াল চিলের বাসার প্রায় কাছাকাছি গিয়ে রাস্তার ধারের এক গর্তের মধ্যে কিছু সময় লুকিয়ে রইল। সেখান থেকে সে দেখতে পেল, চিল দরজা বন্ধ করে গাছের মগডালে কিছু সময় বসে থেকে তারপর উড়ে গেল।

চিল চোখের আড়াল হয়ে গেলে বিড়াল জোরে জোরে হেঁটে চিলের বাসার দিকে গেল। তারপর

গাছ বেয়ে উঠে গেল তরতর করে। উঠে গিয়ে চিলের বাসায় কড়া নাড়াতে লাগল।

বাচ্চারা বলল, কে? কে? কে ওখানে?

বিড়াল ভিজে গলায় বলল, আমি তোমাদের খালা গাংচিল। দরজাটা খুলে দে বাছা। অনেক দূর থেকে এসেছি তোদের দেখতে। তোর মা কোথায় রে? তোর বাবা কোথায় রে? তাদের একটু ডেকে দে। কতদিন দেখা হয়নি।

বাচ্চারা বলল, মা-বাবা বাসায় নেই। খালা হও আর যেই হও, দরজা খুলব না।

বিড়াল খুব নরম করে বলল, মাকে দরকার নেই, তোদের একটু দেখব। একটু দেখেই আবার চলে যাব। তোদের দেখার জন্য মনটা কেমন করছে।

বাচ্চারা বলল, তা করুক। তোমার মন যেমন ইচ্ছে তেমনি করুক। দরজা আমরা খুলব না। মা মানা করেছে দরজা খুলতে।

বিড়ালের তখন খুব রাগ হয়ে গেছে। সে এক লাথি দিয়ে ওদের বাসার দরজা ভেঙে ফেলে বাসার ভিতরে ঢুকে পড়েছে। চিলের বাচ্চারা তাকে দেখে 'খালা না, বিড়াল!' বলে হাউমাউ করে চেঁচিয়ে উঠেছে। ওদের চিৎকার শুনে আশপাশের বাসা থেকে পাখি ছুটে এসেছে ওদের বাসায়। বাবা-চিল ও মা-চিলও তখন বাসায় ফিরে এসেছে।

পাখি আর চিলকে দেখে বিড়াল খুব ভয় পেয়ে গেল। সে এদিক ওদিক পালাবার চেষ্টা করতে লাগল। কিন্তু চেষ্টা করলে কী হবে! সব পাখি চারদিক দিয়ে তাকে ঘিরে ফেলল। পাখিরা মিলে দুষ্ট বিড়ালকে ঠোকর মারতে গেল। বিড়াল তখন গাছ থেকে তাড়াতাড়ি নেমে চোখ বুজে দৌড় দিল। তারপর একদম উধাও হয়ে গেল কাশবনে।

সেই বিড়াল আর কোনো দিন চিলদের বাসার কাছে যায়নি। চিলের বাচ্চারা এখন আর চিঁ চিঁ করে না। কোকিলের বাচ্চারা এখন মন দিয়ে গান শেখে।

অর্থ জেনে নিই

অস্থির — স্থির নয়; বিরক্ত।

তরতর করে — স্বচ্ছন্দে ও দ্রুত গতিতে।

পড়ি কি মরি — অত্যন্ত ব্যস্ততার সাথে।

মগডাল — গাছের সবচেয়ে উঁচু ডাল।

হাতছাড়া — সুযোগ নষ্ট হওয়া।

অনুশীলনী

১. শব্দ নিয়ে খালি ঘর পূরণ করি।

হাতছাড়া	পড়িমরি	তরতর	টপটপ	চটপট

ক. বিড়ালটি ..... করে গাছ বেয়ে উঠে গেল।

খ. ভয়ে সে ..... করে দিল দৌড়।

গ. ..... উত্তর দাও।

ঘ. লোভে জিভ দিয়ে ..... করে পানি পড়ছে।

ঙ. বেশি লোভ করতে গিয়ে তার সুযোগ ..... হয়ে গেল।

২. প্রশ্নের উত্তর বলি ও লিখি।

ক. চিলের বাসায় কে কে থাকত?

খ. চিলের মা-বাবা কেন সবসময় বাসায় থাকত না?

গ. কোকিলের বাচ্চারা কেন ঠিকমতো গান শিখতে পারত না?

ঘ. বিড়াল নিজেকে গাংচিল বলল কেন?

ঙ. চিলের বাচ্চারা কেন দরজা খুলতে চাইল না?

৩. গল্পটি নিজের ভাষায় বলি।

৪. আগের বাক্যের সাথে মিল রেখে পরের বাক্য লিখি।

ক. বিড়ালটি পালানোর চেষ্টা করল। কেননা অন্য পাখিরা তাকে তাড়া করেছে।

খ. আমি আরও খেতে চাই। কেননা .....

গ. আমি বৃষ্টিতে ভিজে গেছি। সেজন্য .....

ঘ. রাতে ঝড় হয়েছে। তাই .....

ঙ. গাছগুলো ভেঙে পড়েছে। কারণ .....

চ. বিড়ালের পেট ফুলে ঢোল হয়ে গেছে। ফলে .....

৫. শেষে বিরামচিহ্ন বসিয়ে বাক্যটি আবার লিখি।

তোমার কলমটি আমায় দেবে	
এবার চলো খেলতে যাই	
কে ওখানে	
এত সুন্দর পাখি	
বাচ্চারা বলল, আচ্ছা	
বৃদ্ধ লোকটি আমার নাম জানতে চাইলেন	
রিনা কত সুন্দর গান করে	
আমি আজ ছবি আঁকব না	

৬. শব্দ সাজিয়ে বাক্য তৈরি করি।

ক. থাকত বাসায় মা-বাবা সবসময় না।

.....

খ. মারামারি চিলের করত বাচ্চারা।

.....

গ. অনেক এসেছি থেকে তোদের দেখতে দূর।

.....

ঘ. লাফ পড়ল মধ্যে বিড়াল পুকুরের দিয়ে।

.....

ঙ. কি চিনতে পারছ তুমি আমাকে?

.....

পাঠ ৯

বৃষ্টির ছড়া

ফররুখ আহমদ

বিষ্টি এলো কাশ বনে
জাগল সাড়া ঘাস বনে,
বকের সারি কোথা রে
লুকিয়ে গেল বাঁশ বনে।

নদীতে নাই খেয়া যে,
ডাকল দূরে দেয়া যে,
কোন সে বনের আড়ালে
ফুটল আবার কেয়া যে।

গাঁয়ের নামটি হাটখোলা,
বিষ্টি-বাদল দেয় দোলা,
রাখাল ছেলে মেঘ দেখে
যায় দাঁড়িয়ে পথ-ভোলা।

মেঘের আঁধার মন টানে,
যায় সে ছুটে কোন খানে,
আউশ ধানের মাঠ ছেড়ে
আমন ধানের দেশ পানে।

অর্থ জেনে নিই

আঁধার	—	অন্ধকার।
কেয়া	—	ফুলের নাম।
খেয়া	—	নদী পারাপারের নৌকা।
গাঁ	—	গ্রাম।
জাগল সাড়া	—	আলোড়ন তৈরি হলো।
দেয়া	—	মেঘ।
বিষ্টি-বাদল	—	মেঘ-বৃষ্টি।
মন টানে	—	মুগ্ধ করে।

অনুশীলনী

১. বর্ণ বসিয়ে শব্দ তৈরি করি।

আ.....ল

কা.....ব.....

বা.....ল

রাখা.....

.....ধার

.....উশ

২. নতুন বাক্য তৈরি করি।

কাশ বন : .....

আড়াল : .....

গাঁ : .....

ফোটা : .....

অন্ধকার : .....

৩. প্রশ্নের উত্তর বলি ও লিখি।

ক. বকের সারি কেন বাঁশ বনে লুকিয়েছে?

খ. নদীতে খেয়া নেই কেন?

গ. কী কী পড়ে বোঝা যায় ছড়াটি বর্ষা ঋতু নিয়ে লেখা?

ঘ. রাখাল ছেলে মেঘ দেখে দাঁড়িয়ে যায় কেন?

ঙ. বৃষ্টির সময়ে কী কী করতে ভালো লাগে?

৪. গদ্যে লিখি।

ক. বিষ্টি এলো কাশ বনে।

কাশ বনে বৃষ্টি এলো।

খ. নদীতে নাই খেয়া যে

.....

গ. লুকিয়ে গেল বাঁশ বনে।

.....

ঘ. যায় সে ছুটে কোন খানে

.....

ঙ. ডাকল দূরে দেয়া যে

.....

চ. ফুটল আবার কেয়া যে।

.....

৫. প্রথম লাইনের সাথে মিলিয়ে পরের লাইন লিখি।

ওই যে দেখো গাড়ি

চলছে তাড়াতাড়ি।

এক যে ছিল রাজা

.....

গাছে সবুজ পাতা

.....

আমার মাথায় চুল

.....

ওই দেখা যায় নদী

.....

এসো আমার সাথে

.....

৬. শব্দ সাজিয়ে বাক্য তৈরি করি।

হয় বর্ষাকালেই বৃষ্টি বেশি সাধারণত।

.....

পানি করা বেশি গরমে দরকার পান বেশি।

.....

পড়াশোনা বিদ্যালয়ে করি একই আমরা।

.....

হলো তোমার সাথে অনেকদিন দেখা পরে।

.....

পাঠ ১০

ময়নামতি

১৮৭৫ সালের ঘটনা। কুমিল্লার পাহাড়গুলোর পাশে রাস্তা তৈরি হচ্ছে। শ্রমিকেরা মাটি কাটছেন সেখানে। হঠাৎ করে তাদের কোদালে পুরানো ইট উঠে এলো। এর আগেও মাটি খোঁড়ার সময়ে পুরানো কিছু জিনিস পাওয়া গিয়েছিল। এসব থেকে ধারণা করা হয়, এখানে একসময় সভ্যতা গড়ে উঠেছিল।

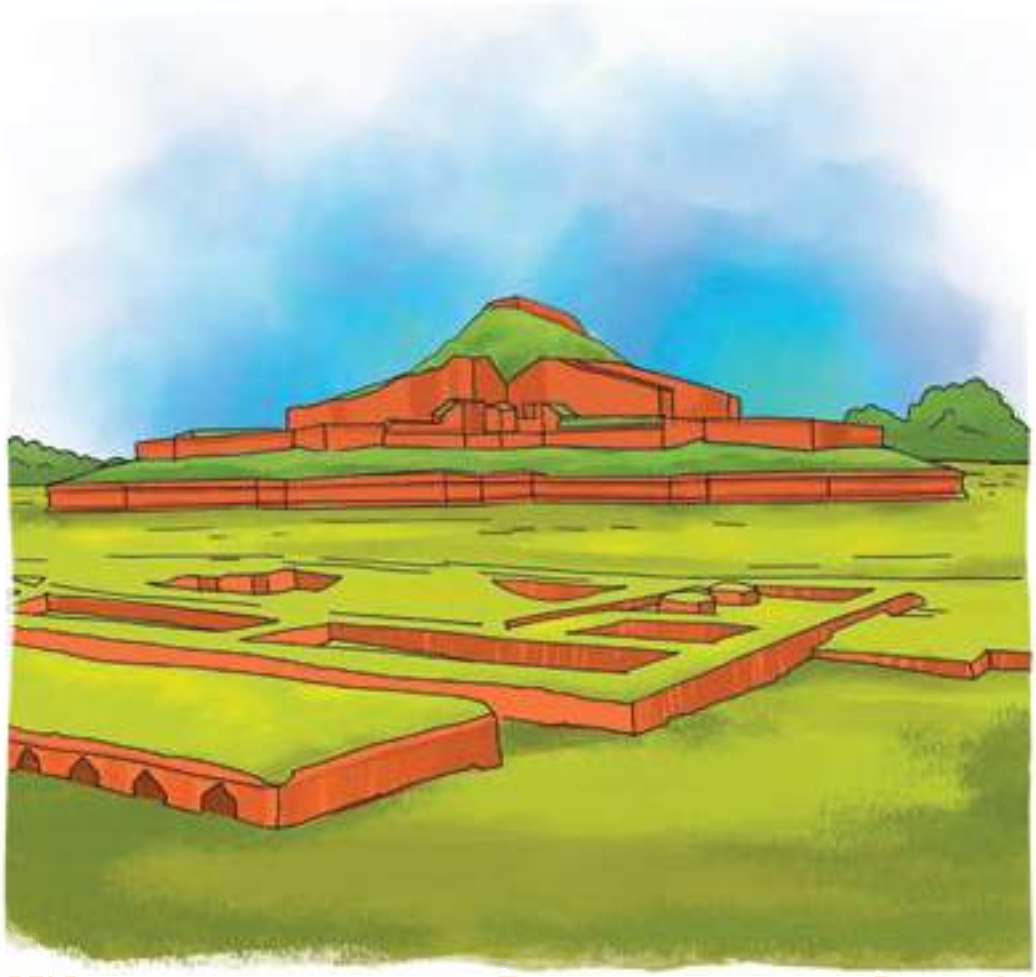

পুরানো সভ্যতার নিদর্শনগুলো সাধারণত মাটির নিচে চাপা পড়ে থাকে। খুব সাবধানে খনন করে সেগুলো বের করতে হয়। মাটি খুঁড়ে এমনই এক সভ্যতা পাওয়া গেছে কুমিল্লার ময়নামতিতে। কুমিল্লার লালমাই পাহাড় এলাকায় ময়নামতি অবস্থিত। এখানে ১৯৫৫ সালে পুরানো সভ্যতার নিদর্শন অনুসন্ধানের কাজ শুরু হয়। তখন এখানকার ইতিহাস মানুষের কাছে স্পষ্ট হতে থাকে। জানা যায়, এ এলাকায় অন্তত ৩০ জন রাজা শাসন করেছেন।

ময়নামতি এলাকায় কয়েকটি পুরানো বিহার পাওয়া গেছে। বিহারগুলো বৌদ্ধদের ধর্মচর্চা ও জ্ঞানচর্চার কেন্দ্র। এখানকার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিহারের নাম শালবন বিহার। এটি প্রায় দেড় হাজার বছরের পুরানো। বিহারটির আকার বর্গের মতো। এর প্রতিটি প্রান্ত ৫৫০ ফুট লম্বা। এর মধ্যে ১১৫টি ঘর আছে। এসব ঘরে বৌদ্ধ ভিক্ষুরা থাকতেন। বিহারের ভিতর থেকে পুরানো অনেক নিদর্শন পাওয়া যায়।

ময়নামতির আরেকটি বিহারের নাম আনন্দ বিহার। এটি আয়তনে সবচেয়ে বড়ো। আনন্দ বিহারও প্রায় দেড় হাজার বছর আগের। এটিরও আকার বর্গের মতো। এর একেকটি প্রান্ত ৬৫০ ফুট লম্বা। ওই এলাকার মানুষের কাছে এটি আনন্দ রাজার বাড়ি নামে পরিচিত। বিহারের বাইরের দেয়ালে পোড়ামাটির নকশা দেখা যায়। পোড়ামাটির নকশার এ রকম কাজকে টেরাকোটা বলে।

কুমিল্লার ময়নামতি ও এর আশেপাশে রয়েছে অনেক পুরাকীর্তি। এখান থেকে পাওয়া গেছে গৌতম বুদ্ধের মূর্তি, মুদ্রা, অলংকার, সিলমোহর। এছাড়া তামার পাতে লেখা রাজার আদেশের সন্ধান মিলেছে। সন্ধান মিলেছে প্রায় পাঁচ হাজার বছর আগের হাতিয়ারের। এমনকি পাওয়া গেছে দৈনন্দিন ব্যবহারের অনেক গৃহস্থালি জিনিস। এসব নমুনা সমৃদ্ধ অতীতের পরিচয় বহন করে। ময়নামতি জাদুঘরে তার কিছু নিদর্শন রাখা হয়েছে। এগুলো থেকে প্রাচীন ইতিহাস ও ঐতিহ্যের অনেক ঘটনা জানা যায়।

এখানকার অনেক জায়গায় এখনও অনুসন্ধান করা হয়নি। অনুসন্ধান করলে হয়তো পুরানো সভ্যতার আরও অনেক নিদর্শন পাওয়া সম্ভব।

অর্থ জেনে নিই

অনুসন্ধান — খোঁজ।

অন্তত — কমপক্ষে।

খনন — খোঁড়া।

জাদুঘর — যেখানে সবার দেখার জন্য মূল্যবান প্রাচীন নিদর্শন রাখা হয়।

টেরাকোটা — নকশা করা পোড়ামাটির ফলক।

নিদর্শন — নমুনা; চিহ্ন; উপকরণ।

পুরাকীর্তি — প্রাচীন কালের নিদর্শন।

বিশ্ববিদ্যালয় — উচ্চতর শিক্ষা প্রতিষ্ঠান।

বিহার — বৌদ্ধদের শিক্ষা ও ধর্মচর্চার কেন্দ্র।

ভিক্ষু — বৌদ্ধ সন্ন্যাসী।

মুদ্রা — ধাতুর তৈরি পয়সা।

সভ্যতা — উন্নত জীবনযাত্রা।

সিলমোহর — নাম বা অন্য কোনো নমুনার ছাপ।

অনুশীলনী

১. ছক থেকে গুচ্ছশব্দ নিয়ে খালি ঘরে বসাই।

মাটির নিচে	আনন্দ বিহার	লালমাই পাহাড়	দেড় হাজার	পুরানো ইট	রাজার আদেশ

ক. মাটি কাটার সময়ে শ্রমিকদের কোদালে উঠে এলো .....।

খ. ..... এলাকায় কুমিল্লার ময়নামতি অবস্থিত।

গ. প্রাচীন সভ্যতা সাধারণত ..... চাপা পড়ে থাকে।

ঘ. ময়নামতি এলাকার সবচেয়ে বড়ো বিহারের নাম .....।

ঙ. আরও পাওয়া গেছে তামার পাতে লেখা .....।

চ. শালবন বিহার ..... বছরের পুরানো।

২. প্রশ্নের উত্তর বলি ও লিখি।

ক. বিহার কী?

খ. শালবন বিহারের বিবরণ দাও।

গ. ময়নামতি জাদুঘরে প্রাচীনকালের কী কী নিদর্শন রাখা আছে?

ঘ. আনন্দ রাজার বাড়ির পরিচয় দাও।

ঙ. টেরাকোটা কাকে বলে?

চ. 'এসব নমুনা সমৃদ্ধ অতীতের পরিচয় বহন করে।' — কথাটি বুঝিয়ে লেখো।

৩. শব্দ সাজিয়ে বাক্য লিখি।

ক. পুরানো অঞ্চলে বিহার কয়েকটি পাওয়া ময়নামতি গেছে।

.....

খ. ঘর শালবন ছিল ১১৫টি বিহারে।

.....

গ. দেয়ালে যায় নকশা বিহারের পোড়ামাটির দেখা বাইরের।

.....

ঘ. আকার মতো বর্গের বিহারটির।

.....

ঙ. খননের আসে জিনিস মাটি সময়ে পুরানো উঠে।

.....

চ. রাজার তামার আদেশ লেখা পাতে আছে।

.....

৪. দাগ টেনে মিল করি এবং বাক্যগুলো পুনরায় লিখি।

ক. কুমিল্লায় প্রাচীন সভ্যতা অনুসন্ধানের কাজ শুরু হয়	৩০ জন রাজা
খ. ময়নামতি অঞ্চলে রাজত্ব করেন অন্তত	৬৫০ ফুট
গ. বর্গাকৃতি শালবন বিহারের প্রতি বাহুর দৈর্ঘ্য	৫৫০ ফুট
ঘ. শালবন বিহারে আছে	আনন্দ রাজার বাড়ি
ঙ. আনন্দ বিহারের আর এক নাম	১১৫টি ঘর
চ. আনন্দ বিহারের এক একটি প্রান্ত	১৯৫৫ সালে

ক. .....

খ. .....

গ. .....

ঘ. .....

ঙ. .....

চ. .....

৫. ঘটনাটি এখনকার/ আগের/ পরের তা লিখি।

ক. এখানে এক রাজা বাস করতেন। আগের ঘটনা

খ. বাইরে বৃষ্টি পড়ছে। .....

গ. শ্রমিকেরা সেদিন মাটি কাটছিল। .....

ঘ. মাটি খনন করলে আরও প্রাচীন নিদর্শন পাওয়া যাবে। .....

ঙ. বহু আগে পাথরের হাতিয়ার ব্যবহৃত হতো। .....

চ. এবারের ছুটিতে তিনি বইটি লেখা শেষ করবেন। .....

ছ. শিক্ষার্থীরা দল বেঁধে বিদ্যালয়ে যাচ্ছে। .....

৬. ছবি দেখে বিবরণ লিখি।

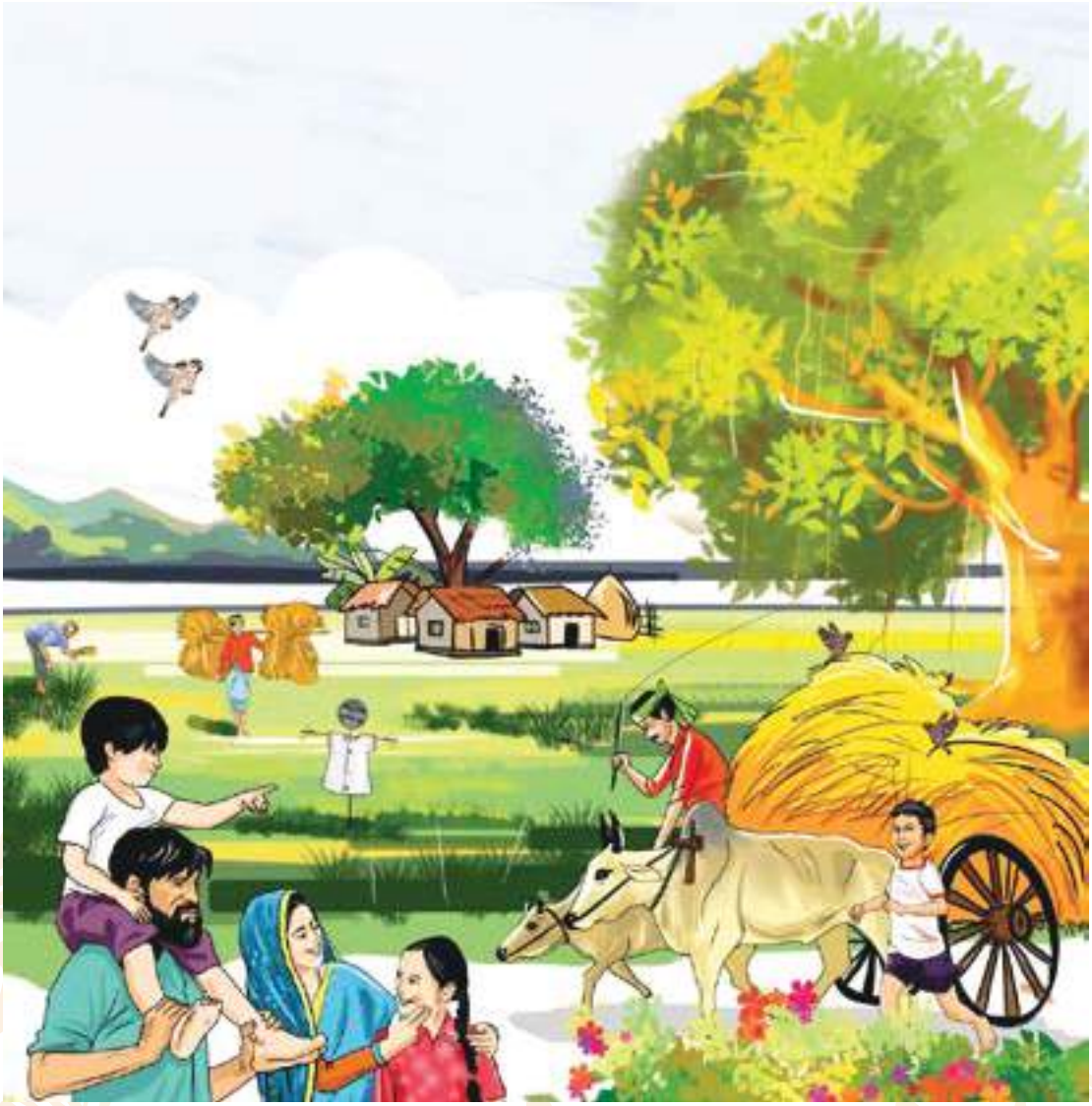

ছবির বিবরণ: .....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

পাঠ ১১

বাঘখেকো শিয়ালের ছানা

উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী

এক শিয়াল আর এক শিয়ালনী ছিল। তাদের তিনটি ছানা ছিল, কিন্তু থাকার জায়গা ছিল না।

তারা ভাবল, ছানাগুলোকে এখন কোথায় রাখি? একটা গর্ত না হলে তো এরা বৃষ্টিতে ভিজে মারা যাবে। তখন তারা অনেক খুঁজে একটা গর্ত বার করল। কিন্তু গর্তের চারধারে দেখল, খালি বাঘের পায়ের দাগ! তা দেখে শিয়ালনী বলল, 'ওগো, এটা যে বাঘের গর্ত! এর ভিতরে কী করে থাকব?'

শিয়াল বলল, 'এত খুঁজেও তো আর গর্ত পাওয়া গেল না। এখানেই থাকতে হবে!'

শিয়ালনী বলল, 'বাঘ যদি আসে তখন কী হবে?'

শিয়াল বলল, 'তখন তুমি খুব করে ছানাগুলোর গায়ে চিমটি কাটবে। তাতে তারা চেঁচাবে। আর আমি জিজ্ঞেস করব—ওরা কাঁদছে কেন? তখন তুমি বলবে—ওরা বাঘ খেতে চায়।'

তা শুনে শিয়ালনী বলল, 'বুঝেছি। আচ্ছা, বেশ!' বলেই সে খুব খুশি হয়ে গর্তের ভিতরে ঢুকল। তখন থেকে তারা সেই গর্তের ভিতরেই থাকে।

এমনি করে কিছু দিন যায়। শেষে একদিন তারা দেখল যে ওই বাঘ আসছে। অমনি শিয়ালনী তার ছানাগুলোকে ধরে খুব চিমটি কাটতে লাগল। তখন ছানাগুলো চেঁচাতে শুরু করল।

শিয়াল তখন খুব মোটা আর বিশ্রী গলার সুর করে জিজ্ঞেস করল, 'খোকারা কাঁদছে কেন?'

শিয়ালনী তেমনি বিশ্রী সুরে বলল, 'ওরা বাঘ খেতে চায়। তাই কাঁদছে।'

বাঘ তার গর্তের দিকে আসছিল। এর মধ্যে 'ওরা বাঘ খেতে চায়' শুনে সে থমকে দাঁড়াল। সে ভাবল, 'বাবা! আমার গর্তের ভিতর না জানি ওগুলো কী ঢুকে রয়েছে। নিশ্চয় ভয়ানক রাক্ষস হবে, নইলে কি ওদের খোকারা বাঘ খেতে চায়!'

তখুনি শিয়াল বলল, 'আর বাঘ কোথায় পাব? যা ছিল সবই তো ধরে এনে ওদের খাইয়েছি!'

তাতে শিয়ালনী বলল, 'তা বললে কি হবে? যেমন করে পারো একটা ধরে আনো, নইলে খোকারা থামছে না।' বলে সে ছানাগুলোকে আরও বেশি করে চিমটি কাটতে লাগল।

তখন শিয়াল বলল, 'আচ্ছা, রোসো রোসো। ওই যে একটা বাঘ আসছে। আমার ঝপাংটা দাও, এখুনি ওকে ভতাং করছি।'

ঝপাং বলেও কিছু নেই, ভতাং বলেও কিছু নেই—সব শিয়ালের ফাঁকি। বাঘের কিন্তু সেই ঝপাং আর ভতাং শুনেই প্রাণ উড়ে গেল, সে ভাবল, 'মাগো, এই বেলা পালাই। নইলে না জানি কী দিয়ে কী করবে এসে!' বলে সে আর সেখানে একটুও দাঁড়াল না। শিয়াল চেয়ে দেখল যে, সে লাফিয়ে লাফিয়ে ঝোপ-জঙ্গল ডিঙিয়ে ছুটে পালাচ্ছে! তখন শিয়াল আর শিয়ালনী লম্বা নিঃশ্বাস ছেড়ে বলল, 'যাক, আপদ কেটে গেছে।'

বাঘ তখনও এমনি ছুটেছে যে তেমন আর সে কখনও ছোটেনি।

একটা বানর গাছের উপর থেকে তাকে ছুটতে দেখে ভারি আশ্চর্য হয়ে ভাবল, তাই তো, বাঘ এমনি করে ছুটছে, এ তো সহজ কথা নয়! নিশ্চয় একটা ভয়ানক কিছু হয়েছে! এই ভেবে সে বাঘকে ডেকে জিজ্ঞেস করল, 'বাঘ ভাই, বাঘ ভাই, কী হয়েছে? তুমি যে অমন করে ছুটে পালাচ্ছো?'

বাঘ হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, 'সাধে কি পালাচ্ছি? নইলে এক্ষুণি আমাকে ধরে খেতো!'

বানর বলল, 'তোমাকে ধরে খায় এমন কোনো জানোয়ারের কথা তো আমি জানি না। ও কথা আমার বিশ্বাস হচ্ছে না!'

বাঘ বলল, ‘সেখানে থাকতে বাপু, তবে দেখতাম! দূর থেকে অমনি করে সকলেই বলতে পারে!’

বানর বলল, ‘আমি যদি সেখানে থাকতাম, তবে তোমাকে বুঝিয়ে দিতাম যে সেখানে কিছু নেই। তুমি বোকা, তাই মিছামিছি অত ভয় পেয়েছ।’

এ কথায় বাঘের ভারি রাগ হলো। সে বলল, ‘বটে! আমি বোকা? আর তোমার বুঝি ঢের বুদ্ধি! চলো তো একবার সেখানে যাই।’

বানর বলল, ‘যাব বইকি, যদি আমাকে পিঠে করে নিয়ে যাও।’

বাঘ বলল, ‘তাই সই! আমার পিঠে বসেই চলো!’ এই বলে সে বানরকে পিঠে করে আবার গর্তের দিকে ফিরে চলল।

শিয়াল আর শিয়ালনী সবে ছানাদের শান্ত করে একটু বসেছে। আর অমনি বানরকে পিঠে করে বাঘ আবার আসছে। তখন শিয়ালনী তাড়াতাড়ি ছুটে গিয়ে আবার ছানাগুলোকে চিমটি কাটতে লাগল, ছানাগুলোও ভূতের মতো চ্যাঁচাতে শুরু করল।

তখন শিয়াল আবার সেই রকম সুর করে বলল, ‘আরে থামো, থামো! অত চেঁচিও না—অসুখ করবে।’

শিয়ালনী বলল, ‘আমি বলছি, যতক্ষণ না একটা বাঘ এনে এদের খেতে দেবে, ততক্ষণ এরা কিছুতেই থামবে না।’

শিয়াল বলল, ‘আমি যে ওদের মামাকে বাঘ আনতে পাঠিয়েছি। এখুনি সে বাঘ নিয়ে আসবে। তোমরা থামো!’

তারপর একটু চুপ করেই সে আবার বলল, ‘ওই, ওই! ওই যে তোদের বাঁদর মামা একটা বাঘ ধরে এনেছে! আর কাঁদিস না। শিগগির ঝপাংটা দে, ভতাং করি!’

বানরের এতক্ষণ খুব সাহস ছিল। কিন্তু ঝপাং আর ভতাঙের কথা শুনে আর সে বসে থাকতে পারল না। সে এক লাফে একটা গাছে উঠে, দেখতে দেখতে কোথায় পালিয়ে গেল।

আর বাঘের কথা কী আর বলব! সে যে সেইখান থেকে ছুট দিল, দুদিনের মধ্যে আর দাঁড়ালই না।

তারপর থেকে আর শিয়ালদের কোনো কষ্ট হয়নি। তারা মনের সুখে সেই গর্তে থেকে দিন কাটাতে লাগল।

অর্থ জেনে নিই

এক্ষুণি — এখুনি; এখনি; এখনই।

জানোয়ার — জন্তু; প্রাণী।

ঢের — যথেষ্ট; অনেক।

থমকে দাঁড়ানো — ভয়ে বা অবাক হয়ে হঠাৎ দাঁড়িয়ে যাওয়া।

প্রাণ উড়ে যাওয়া — ভীষণ ভয় পাওয়া।

বিশ্রী গলা — বাজে কণ্ঠ।

রোসো — অপেক্ষা করো; ধৈর্য ধরো।

অনুশীলনী

১. প্রশ্নের উত্তর বলি ও লিখি।

ক. কোন দুটো শব্দ শুনে বাঘ ভয় পেয়ে গেল?

খ. শিয়ালনী গর্তে ছানাগুলোকে রাখতে ভয় পেল কেন?

গ. বাঘকে দৌড়াতে দেখে বানর কী বলল?

ঘ. বাঘ ও বানরের মধ্যে কে বেশি ভয় পেল? কীভাবে তুমি বুঝলে?

ঙ. শিয়ালের বুদ্ধি বেশি—গল্প থেকে কীভাবে তা বোঝা যায়?

২. ‘বাঘখেকো শিয়ালের ছানা’ গল্পটি নিজের ভাষায় বলি।

৩. খালি জায়গায় শব্দ বসাই।

চেয়ারে	গানের	ফাঁকা	জন্মদিন	বাচ্চা	বেঁটে বানরের
বানর	সেজেগুজে	কলা	ছাগল	রাজি	আনন্দ

আজ শেয়ালের .....। সবার মনেই .....। খাওয়া-দাওয়া হবে। গান-বাজনাও হবে। বনের পশুরা গান গাইবে। বনের মধ্যে একটু ..... জায়গা। এখানেই হবে ..... আসর। এই জায়গাটা .....। ও এমনিতেই আজকের জন্য জায়গাটা ছেড়ে দিয়েছে। এর জন্য বানর আজ ..... নেবে না। ..... শিয়ালও এসেছে। শিয়াল ..... বসবে না। ও বসবে তালের আঁটির উপর। কে এনে দেবে তা? কেউই রাজি না। অনেক আলোচনার পর সেখানে ..... এসে দাঁড়াল। ভ্যা ভ্যা করে বলল, 'শিয়াল আমার ..... ধরে ধরে খায়। ওকে বলো, আর যেন এ রকম না করে। শিয়াল ..... হলো। শুরু হলো জন্মদিনের অনুষ্ঠান।

৪. শব্দগুলো সাজিয়ে বাক্য তৈরি করি।

চুপ বসো সবাই করে।

.....

দাও গ্লাস দয়া আমাকে পানি করে এক।

.....

না বলতে একটু আমাকে দাও!

.....

সুন্দর এঁকেছো কী ছবি!

.....

কত এলে তুমি দিন পরে!

.....

কি থাকতে একসময়ে তোমরা এখানে?

.....

৫. কারণ অনুযায়ী বাক্যের দ্বিতীয় অংশ লিখি।

তারা থাকার জায়গা পেল না। তাই গাছের ডালে উঠে রাত কাটাল।

গর্তের চারদিকে দেখল বাঘের পায়ের ছাপ। সেজন্য .....

আমার খুব ঘুম পাচ্ছে। অতএব.....

আমার গানের কথা মুখস্থ নেই। সুতরাং .....

আজ বিদ্যালয়ে যেতে পারিনি। ফলে .....

আমি আসার আগেই তুমি চলে গেলে। এ কারণে .....

৬. নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ি।

তিথি আর তমাল চতুর্থ শ্রেণিতে পড়ে। এখন টিফিনের জন্য বিরতি। তমাল তিথিকে ডেকে বলল, 'আজ কী বার?' তিথি আঙুল দিয়ে ক্যালেন্ডার দেখিয়ে বলল, 'আজ রবিবার।' তিথি আরও বলল, 'তোমার বার মনে নেই কেন? গতকাল তো আমরা স্কুলে আসিনি। শনিবার ছিল।' তমাল হেসে বলল, 'আমি জানি।' আরও বলল, 'দিনের নামটা তোমার জানা আছে কি না তা যাচাই করছিলাম।'

তিথি যা যা বলেছে সেগুলো হুবহু লিখি।

.....

.....

.....

.....

.....

তমাল যা যা বলেছে সেগুলো হুবহু লিখি।

.....

.....

.....

.....

.....

৭. শিক্ষকের সহায়তায় 'বাঘখেকো শিয়ালের ছানা' গল্পটি অভিনয় করি।

পাঠ ১২

কাজলা দিদি

যতীন্দ্রমোহন বাগচী

বাঁশবাগানের মাথার উপর চাঁদ উঠেছে ওই–
মাগো, আমার শোলক-বলা কাজলা দিদি কই?
পুকুর ধারে, নেবুর তলে থোকায় থোকায় জোনাই জ্বলে–
ফুলের গন্ধে ঘুম আসে না, একলা জেগে রই;
মাগো, আমার কোলের কাছে কাজলা দিদি কই?

সে দিন হতে দিদিকে আর কেনই-বা না ডাকো,
দিদির কথায় আঁচল দিয়ে মুখটি কেন ঢাকো?
খাবার খেতে আমি যখন দিদি বলে ডাকি, তখন
ও-ঘর থেকে কেন মা আর দিদি আসে নাকো,
আমি ডাকি– তুমি কেন চুপটি করে থাকো?

বল মা, দিদি কোথায় গেছে, আসবে আবার কবে?
কাল যে আমার নতুন ঘরে পুতুল-বিয়ে হবে!
দিদির মতন ফাঁকি দিয়ে আমিও যদি লুকোই গিয়ে–
তুমি তখন একলা ঘরে কেমন করে রবে?
আমিও নাই দিদিও নাই– কেমন মজা হবে!

ভুঁইচাপাতে ভরে গেছে শিউলি গাছের তল,
মাড়াস নে মা পুকুর থেকে আনবি যখন জল;
ডালিম গাছের ডালের ফাঁকে বুলবুলিটি লুকিয়ে থাকে,
দিস না তারে উড়িয়ে মা গো, ছিঁড়তে গিয়ে ফল–
দিদি এসে শুনবে যখন, বলবে কী মা বল!

বাঁশবাগানের মাথার উপর চাঁদ উঠেছে ওই–
এমন সময়, মাগো, আমার কাজলা দিদি কই?
বেড়ার ধারে, পুকুর পাড়ে ঝিঁঝি ডাকে ঝোপে-ঝাড়ে;
নেবুর গন্ধে ঘুম আসে না– তাইতে জেগে রই;
রাত হলো যে, মাগো, আমার কাজলা দিদি কই?

অর্থ জেনে নিই

জোনাই — জোনাকি পোকা।

তাইতে — তাইতো; সেজন্য।

নেবু — লেবু।

ভুঁইচাঁপা — এক ধরনের ফুল।

মাড়ানো — পা দিয়ে পিষে দেওয়া।

শোলক — শ্লোক; ছোটো ছড়া।

কবিতায় যা বলা হয়েছে

ছোট্ট বোনটির সারাক্ষণের সাথি ছিল কাজলা দিদি। দিদি চিরদিনের জন্য তাদের ছেড়ে চলে গেছে। ছোট বোনটি তা জানে না, বোঝে না। প্রতি মুহূর্তেই সে তার প্রিয় কাজলা দিদির অপেক্ষায় থাকে। সে কোথায় গেছে, কেন সে আসে না তা জানতে চায় তার মায়ের কাছে। মা উত্তর দিতে পারেন না। মুখ লুকিয়ে শুধু কাঁদেন।

অনুশীলনী

১. কবিতা থেকে মিল-শব্দ খুঁজে বের করি।

ওই, কই

.....

.....

.....

.....

২. শব্দ দিয়ে নতুন বাক্য লিখি।

জোনাই : .....

নেবু : .....

ভুঁইচাঁপা : .....

মাড়াসনে : .....

শোলক : .....

৩. মিল-শব্দ লিখি।

পাতা : আতা, খাতা, ছাতা, মাতা, যা-তা, হাতা।

ফুল : .....

ঘুম : .....

ডাকা : .....

মজা : .....

৪. প্রশ্নের উত্তর বলি ও লিখি।

ক. কাজলা দিদি কোথায় গেছে?

খ. কখন কাজলা দিদির কথা বেশি মনে পড়ে?

গ. কাজলা দিদির কথা উঠলে মা আঁচল দিয়ে মুখ ঢাকেন কেন?

ঘ. পুতুলের বিয়ের সময় দিদির কথা মনে পড়ে কেন?

ঙ. আমিও নাই দিদিও নাই– কেমন মজা হবে! – এ কথা দিয়ে কী বোঝানো হয়েছে?

চ. খুকি মাকে কেন ডালিম গাছের ফল ছিঁড়তে বারণ করেছে?

৫. কবিতায় খুকি মাকে যা যা বলেছে, তা নিজের ভাষায় লিখি।

৬. সঠিক উত্তরটি বেছে নিই ও খাতায় লিখি।

ক. কোথায় জোনাকি জ্বলে?

১. নেবুর তলে ২. বাঁশবাগানে

৩. শিউলিতলে ৪. তাল তলায়

খ. বুলবুলি কোথায় লুকিয়ে থাকে?

১. শিউলির ডালে ২. ভুঁইচাঁপার ডালে

৩. আমের ডালে ৪. ডালিমের ডালে

গ. খুকির ঘুম আসে না কেন?

১. নেবুর গন্ধে ২. ঝিঁঝির ডাকে

৩. চাঁদের আলোতে ৪. ফুলের গন্ধে

৭. বিপরীত শব্দ লিখি।

দিন :

ঘুম :

জ্বলা :

নতুন :

উপর :

পাঠ ১৩

দানবীর মুহসিন

গভীর রাত। চারদিক নীরব। হাজি মুহম্মদ মুহসিন ঘুমিয়ে আছেন। শেষ রাতে খুটখাট শব্দে তাঁর ঘুম ভেঙে গেল। তিনি উঠে আলো জ্বালালেন। কিন্তু ঘরে তেমন কিছুই দেখতে পেলেন না। তাঁর মনে হলো ইঁদুর হতে পারে। হয়তো খাটের নিচে লুকিয়েছে। তিনি খাটের নিচে তাকালেন। দেখলেন একজন লোক। লোকটাকে বের হয়ে আসতে বললেন। ভয়ে লোকটি বের হতে চাইল

না। হাজি মুহসিন বাড়ির পাহারাদারকে ডাকলেন। সে লোকটি বের করে আনল। পাহারাদার লোকটিকে থানায় দিতে চাইল।

লোকটি ভয়ে কাঁপছে। হাজি মুহসিন বললেন, 'তুমি ঘরে ঢুকেছো কেন?' লোকটি বলল, 'অভাবের কারণে চুরি করতে এসেছি, হুজুর।' তিনি লোকটির অভাবের কথা মন দিয়ে শুনলেন। তাঁর দয়া হলো। তিনি লোকটিকে টাকা-পয়সা দিয়ে বললেন, 'আর চুরি করো না। এই টাকা দিয়ে কিছু কিনে নাও। গ্রামের বাজারে একটা দোকান দাও। ব্যবসা শুরু করো।'

আনন্দে লোকটির কান্না পেল। সে অনেক কৃতজ্ঞ হলো। পরদিন সে সবাইকে এই ঘটনা বলল। লোকেরা বলল, মুহসিন সত্যিকারের মহৎ। তিনি অনেক বড়ো হৃদয়ের অধিকারী। তিনি সবসময় সবাইকে দান করেন। এ জন্যই তিনি দানবীর মুহসিন।

হাজি মুহম্মদ মুহসিনের জন্ম ১৭৩২ সালে ভারতের হুগলিতে। পিতা হাজি ফয়জুল্লাহ, মাতা জয়নাব খানম। তাঁর পিতা ধনী ব্যক্তি ছিলেন। পিতার কাছ থেকে তিনি প্রচুর সম্পত্তি পান। বোন মন্নুজানের কাছ থেকেও সম্পত্তি লাভ করেন। তিনি এই সম্পদ মানুষের ও সমাজের কল্যাণে ব্যয় করেন। তিনি ছিলেন ধর্মপ্রাণ। খুব সাধারণ জীবনযাপন করতেন। দানশীলতার জন্য তিনি বিখ্যাত হন।

হাজি মুহম্মদ মুহসিন তাঁর বিশাল সম্পদ মুসলমানদের শিক্ষা ও সমাজ কল্যাণের জন্য দান করে যান। সেই অর্থে অনেক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে। এসব প্রতিষ্ঠানে অসংখ্য শিক্ষার্থী পড়াশোনা করে। তাঁর অর্থ-সম্পদ দেখভালের জন্য ট্রাস্ট প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে।

১৮১২ সালে এ মহান দানবীরের মৃত্যু হয়।

অর্থ জেনে নিই

কৃতজ্ঞ — উপকারীর উপকার স্বীকার করে যে।

ট্রাস্ট — কমিটি বা সংগঠন।

দেখভাল — দেখাশোনা।

অনুশীলনী

১. পাঠ থেকে যুক্তবর্ণ খুঁজি। ভেঙে লিখি এবং নতুন শব্দ তৈরি করি।

শব্দ	যুক্তবর্ণ	ভাঙলে হয়	নতুন শব্দ
মুহম্মদ	ম্ম	ম+ম	আম্মা, সম্মান
.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....

২. বিপরীত শব্দ লিখি এবং বিপরীত শব্দ দিয়ে বাক্য তৈরি করি।

শব্দ	বিপরীত শব্দ	বাক্য
ব্যয়	.....	.....
ভয়	.....	.....
দয়ালু	.....	.....
কান্না	.....	.....
প্রচুর	.....	.....
ধনী	.....	.....

৩. প্রশ্নের উত্তর বলি ও লিখি।

ক. হাজি মুহম্মদ মুহসিন কেমন জীবনযাপন করতেন?

খ. হাজি মুহম্মদ মহসিনের ঘুম ভেঙে গিয়েছিল কেন?

গ. চুরি করতে আসা লোকটিকে হাজি মুহসিন কী পরামর্শ দিলেন?

ঘ. হাজি মুহম্মদ মুহসিনকে কেন দানবীর বলা হয়?

ঙ. 'মুহসিন সত্যিকারের মহৎ।'—এ কথা দিয়ে কী বোঝানো হয়েছে?

৪. উদ্ধৃতিচিহ্ন বসিয়ে লিখি।

লোকটি ভয়ে কাঁপছে। মুহসিন বললেন, তুমি ঘরে ঢুকেছো কেন? লোকটি বলল, অভাবের কারণে চুরি করতে এসেছি, হুজুর। মুহসিন লোকটির অভাবের কথা মন দিয়ে শুনলেন। তাঁর দয়া হলো। তিনি তাকে টাকা-পয়সা দিলেন। বললেন, আর চুরি করো না। এই টাকা দিয়ে কিছু কিনে নাও। গ্রামের বাজারে একটা দোকান দাও। ব্যবসা শুরু করো।

৫. পাঠ থেকে কে, কারা, কী, কেন, কোথায়, কখন, কেমন, কীভাবে ইত্যাদি শব্দ ব্যবহার করে প্রশ্নবাক্য তৈরি করি।

কে :

কারা :

কী :

কেন :

কোথায় :

কখন :

কেমন :

কীভাবে :

৬. নিচের শব্দগুলো দিয়ে খালিঘর পূরণ করি।

প্রচুর	মহৎ	খুব	অধিকারী	সম্পদ	কৃতজ্ঞ	ট্রাস্ট

ক. হাজি মুহম্মদ মুহসিন একজন ..... মানুষ।

খ. তাঁর সংগ্রহে ..... বই আছে।

গ. তিনি সৎ চরিত্রের .....।

ঘ. আমি মাকে ..... ভালোবাসি।

ঙ. অসৎ পথে ..... অর্জন করা ঠিক নয়।

৭. গরিব-দুঃখীর জন্য আমি কী করতে পারি তা বলি ও লিখি।

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

পাঠ ১৪

অমল ও দইওয়ালা

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

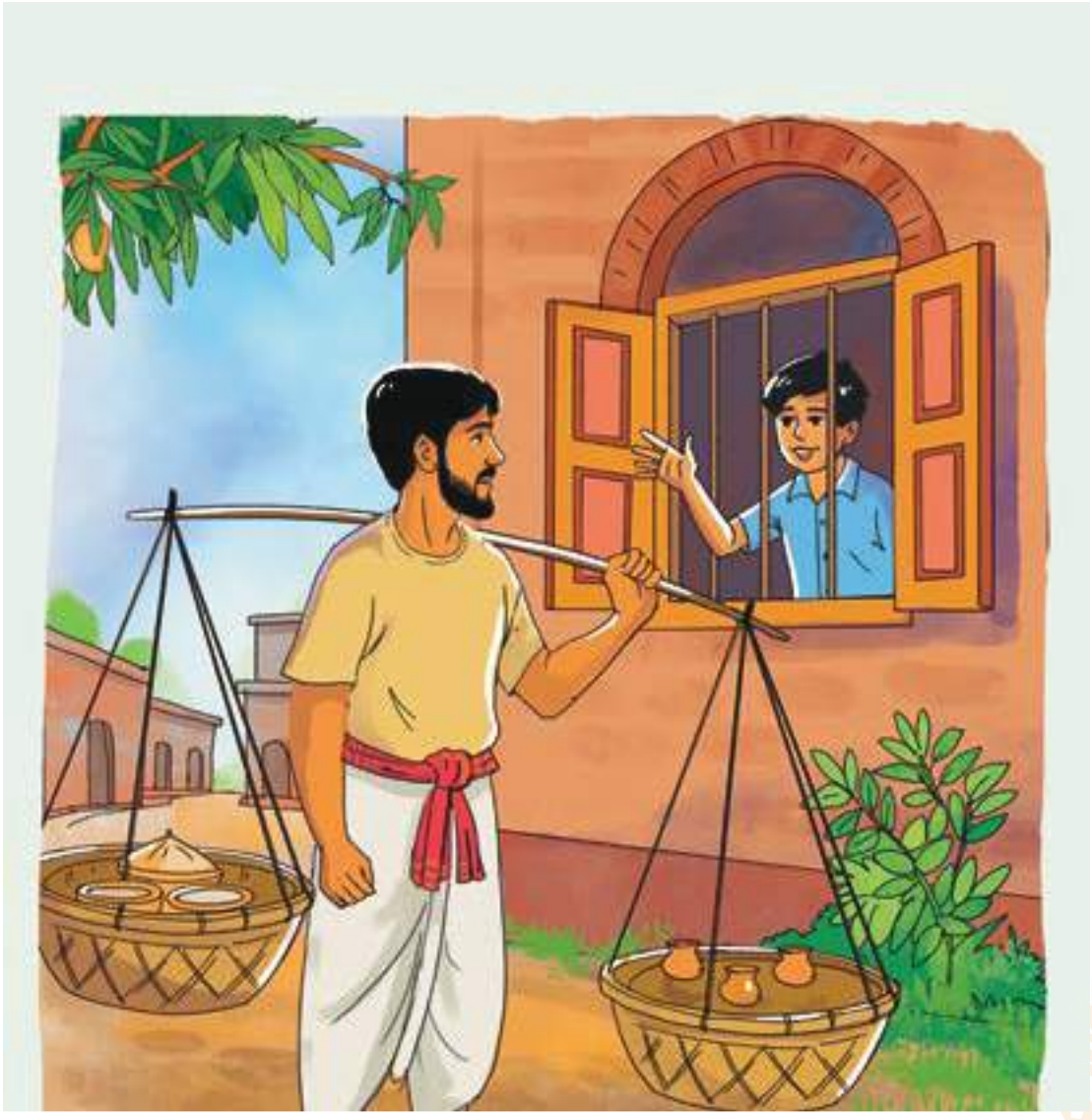

দইওয়ালা : দই-দই-ভালো দই!

অমল : দইওয়ালা, দইওয়ালা, ও দইওয়ালা!

দইওয়ালা : ডাকছো কেন? দই কিনবে?

অমল : কেমন করে কিনব! আমার তো পয়সা নেই।

দইওয়ালা : কেমন ছেলে তুমি। কিনবে না তো আমার বেলা বইয়ে দাও কেন?

অমল : আমি যদি তোমার সঙ্গে চলে যেতে পারতুম তো যেতুম।

দইওয়ালা : আমার সঙ্গে!

অমল : হ্যাঁ। তুমি যে কত দূর থেকে হাঁকতে হাঁকতে চলে যাচ্ছ। শুনে, আমার মন কেমন করছে।

দইওয়ালা : (দইয়ের বাঁক নামিয়ে) বাবা, তুমি এখানে বসে কী করছ?

অমল : কবিরাজ আমাকে বেরোতে বারণ করেছে, তাই আমি সারাদিন এইখেনেই বসে থাকি।

দইওয়ালা : আহা, বাছা তোমার কী হয়েছে?

অমল : আমি জানিনে। আমি তো কিচ্ছু পড়িনি, তাই আমি জানিনে আমার কী হয়েছে। দইওয়ালা, তুমি কোথা থেকে এসেছ?

দইওয়ালা : আমাদের গ্রাম থেকে আসছি।

অমল : তোমাদের গ্রাম? অনে—ক দূরে তোমাদের গ্রাম?

দইওয়ালা : আমাদের গ্রাম সেই পাঁচমুড়া পাহাড়ের তলায়। শামলী নদীর ধারে।

অমল : পাঁচমুড়া পাহাড়—শামলী নদী—কী জানি, হয়তো তোমাদের গ্রাম দেখেছি—কবে সে আমার মনে পড়ে না।

দইওয়ালা : তুমি দেখেছ? পাহাড় তলায় কোনোদিন গিয়েছিলে নাকি?

অমল : না, কোনোদিন যাইনি। কিন্তু আমার মনে হয় যেন আমি দেখেছি। অনেক পুরোনো কালের খুব বড়ো বড়ো গাছের তলায় তোমাদের গ্রাম—একটি লাল রঙের রাস্তার ধারে। না?

দইওয়ালা : ঠিক বলেছ বাবা।

অমল : সেখানে পাহাড়ের গায়ে সব গরু চরে বেড়াচ্ছে।

দইওয়ালা : কী আশ্চর্য! ঠিক বলছ। আমাদের গ্রামে গরু চরে বইকি, খুব চরে।

অমল : মেয়েরা সব নদী থেকে জল তুলে মাথায় কলসি করে নিয়ে যায়—তাদের লাল শাড়ি পরা।

দইওয়ালা : বা! বা! ঠিক কথা। আমাদের সব গয়লাপাড়ার মেয়েরা নদী থেকে জল তুলে তো নিয়ে যায়ই। তবে কি না তারা সবাই যে লাল শাড়ি পরে তা নয়। কিন্তু বাবা, তুমি নিশ্চয় কোনোদিন সেখানে বেড়াতে গিয়েছিলে!

অমল : সত্যি বলছি দইওয়ালা, আমি একদিনও যাইনি। কবিরাজ যেদিন আমাকে বাইরে যেতে বলবে, সেদিন তুমি নিয়ে যাবে তোমাদের গ্রামে?

দইওয়ালা : যাব বইকি বাবা, খুব নিয়ে যাব!

অমল : আমাকে তোমার মতো ওইরকম দই বেচতে শিখিয়ে দিয়ো। ওইরকম বাঁক কাঁধে নিয়ে—ওইরকম খুব দূরের রাস্তা দিয়ে।

দইওয়ালা : মরে যাই! দই বেচতে যাবে কেন বাবা? এত এত পুঁথি পড়ে তুমি পণ্ডিত হয়ে উঠবে।

অমল : না, না, আমি কক্‌খনো পণ্ডিত হব না। আমি তোমাদের রাঙা রাস্তার ধারে তোমাদের বুড়ো বটের তলায় গোয়ালপাড়া থেকে দই নিয়ে এসে দূরে দূরে গ্রামে গ্রামে বেচে বেচে বেড়াব। কী রকম করে তুমি বলো, দই, দই, দই—ভালো দই। আমাকে সুরটা শিখিয়ে দাও।

দইওয়ালা : হায় পোড়াকপাল! এ সুরও কি শেখবার সুর!

অমল : না, না, ও আমার শুনতে খুব ভালো লাগে। আকাশের খুব শেষ থেকে যেমন পাখির ডাক শুনলে মন উদাস হয়ে যায়—তেমনি ওই রাস্তার মোড় থেকে ওই গাছের সারির মধ্যে দিয়ে যখন তোমার ডাক আসছিল, আমার মনে হচ্ছিল—কী জানি কী মনে হচ্ছিল!

দইওয়ালা : বাবা, এক ভাঁড় দই তুমি খাও।

অমল : আমার তো পয়সা নেই।

দইওয়ালা : না না না না—পয়সার কথা বোলো না। তুমি আমার দই একটু খেলে আমি কত খুশি হব।

অমল : তোমার কি অনেক দেরি হয়ে গেল?

দইওয়ালা : কিচ্ছু দেরি হয়নি বাবা, আমার কোনো লোকসান হয়নি। দই বেচতে যে কত সুখ সে তোমার কাছে শিখে নিলুম। [প্রস্থান]

অর্থ জেনে নিই

উদাস — উদাসীন; আনমনা।

কবিরাজ — গাছগাছালি দিয়ে চিকিৎসা করেন যিনি।

বেলা বইয়ে দেওয়া — দেরি করিয়ে দেওয়া।

হাঁকতে হাঁকতে — উঁচু গলায় ডাকতে ডাকতে।

অনুশীলনী

১. ডানপাশ থেকে শব্দ নিয়ে খালি জায়গায় বসাই।

ক. কথা বলতে বলতে ..... গেল।	কবিরাজ
খ. মাথায় করে সবজি নিয়ে ..... চলে যাচ্ছে।	হাঁকতে হাঁকতে
গ. ..... ঘরের বাইরে যেতে নিষেধ করেছেন।	বাছা
ঘ. আহা! ..... আবার ঘুমিয়ে পড়েছে।	উদাস
ঙ. ..... মনে কী যেন ভাবছে ও।	বেলা বয়ে

২. বন্ধনীতে দেওয়া প্রশ্নের উত্তর যোগ করে বাক্য বড়ো করি।

ক. নদী থেকে জল তুলে মাথায় কলসি করে নিয়ে যায়। (কারা?)

মেয়েরা নদী থেকে জল তুলে মাথায় কলসি করে নিয়ে যায়।

খ. কবিরাজ বেরোতে বারণ করেছে। (কাকে?)

.....

গ. সব গরু চরে বেড়াচ্ছে। (কোথায়?)

.....

ঘ. তুমি পন্ডিত হয়ে উঠবে। (কীভাবে?)

.....

ঙ. তুমি দই খাও। (কতটুকু?)

.....

৩. প্রশ্নের উত্তর বলি ও লিখি।

ক. দইওয়ালার বাড়ি কোথায়?

খ. অমল কেন দইওয়ালার সাথে যেতে চায়?

গ. অমল কেন দইওয়ালার সাথে যেতে পারছে না?

ঘ. অমল কীভাবে দইওয়ালার গ্রাম সম্পর্কে জানে?

ঙ. অমল দইওয়ালা হতে চায় কেন?

চ. অমলের সাথে কথা বলে দইওয়ালা কীভাবে দই বেচার সুখ খুঁজে পেল?

৪. বিরামচিহ্ন বসিয়ে লিখি।

কিচিরমিচির ডাক শুনে ঘুম ভেঙে যায় বকুলের ওর ভাই পলাশ ও এখনো ঘুমাচ্ছে বকুল পলাশকে ডাক দেয় বলে তাড়াতাড়ি ওঠো ফুল দিতে যেতে হবে শহিদ মিনারে পলাশ উঠে পড়ে বকুল বলে ফুলের ডালাটা কোথায় পলাশ বলে আমি তো ওটা টেবিলের উপরে রেখেছিলাম মা বললেন ওটা আমি বাইরে এনে রেখেছি

৫. নিচের ছবি দেখে দুজনের কথা লিখি।

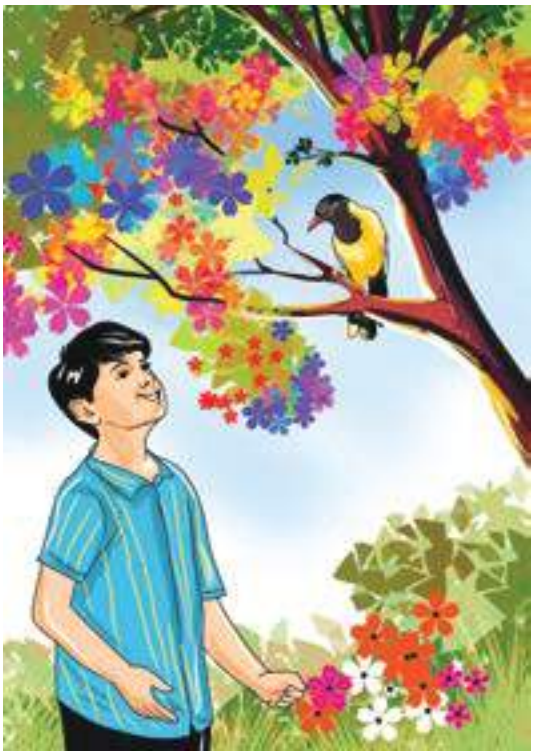

ছেলে :

পাখি :

ছেলে :

পাখি :

ছেলে :

পাখি :

ছেলে :

পাখি :

ছেলে :

৬. শিক্ষকের সহায়তায় ‘অমল ও দইওয়ালা’ নাটিকাটি অভিনয় করি।

পাঠ ১৫

প্রিয় স্বাধীনতা

শামসুর রাহমান

মেঘনা নদী দেব পাড়ি
কলঅলা এক নায়ে।
আবার আমি যাব আমার
পাড়াতলি গাঁয়ে।

গাছ-ঘেরা ঐ পুকুরপাড়ে
বসব বিকেলবেলা।
দুচোখ ভরে দেখব কত
আলোছায়ার খেলা।

বাঁশবাগানে আধখানা চাঁদ
থাকবে ঝুলে একা।
ঝোপেঝাড়ে বাতির মতো
জোনাক যাবে দেখা।

ধানের গন্ধ আনবে ডেকে
আমার ছেলেবেলা–
বসবে আবার দুচোখ জুড়ে
প্রজাপতির মেলা।

হঠাৎ আমি চমকে উঠি
হলদে পাখির ডাকে;
ইচ্ছে করে ছুটে বেড়াই,
মেঘনা নদীর বাঁকে।

শত যুগের ঘন আঁধার
গাঁয়ে আজো আছে।
সেই আঁধারে মানুষগুলো
লড়াই করে বাঁচে।

মনে আমার ঝলসে ওঠে
একাত্তরের কথা,
পাখির ডানায় লিখেছিলাম–
'প্রিয় স্বাধীনতা'।

(সংক্ষেপিত)

অর্থ জেনে নিই

কলঅলা — ইঞ্জিন চালিত।

আঁধার — অন্ধকার।

নায়ে — নৌকায়।

অনুশীলনী

১. শব্দ দিয়ে বাক্য লিখি।

রঙে	হলদে	হঠাৎ	মেলা	গন্ধ

ক. নদীটা ... ... বাঁক নিয়েছে।

খ. প্রজাপতির ডানা নানা ... ... রাঙানো।

গ. গোলাপ ফুলের ... ... খুব ভালো লাগে।

ঘ. জামার ... ... দাগটা এখনও রয়ে গেছে।

ঙ. প্রতি বছর এই গ্রামে বড় ... ... বসে।

২. সঠিক উত্তর বাছাই করে বাক্যটি পুনরায় লিখি।

ক. কবিতায় (পদ্মা/ মেঘনা/ সুরমা/ যমুনা) নদীর কথা বলা হয়েছে।

.....

খ. ঝোপে ঝাড়ে (সাপ/ পাখি/ জোনাক/ কাশফুল) দেখা যাবে।

.....

গ. হলুদ পাখির ডাকে আমি (নেচে/ লাফিয়ে/ হেসে/ চমকে) উঠি।

.....

ঘ. ইচ্ছে করে মেঘনা নদীর বাঁকে (ছুটে বেড়াই/ ঘুরে বেড়াই/ বসে থাকি/ গান গাই)।

.....

ঙ. আধখানা চাঁদ (বাঁশবাগানে/ আমবাগানে/ ফুলবাগানে/ কাশবনে) একা ঝুলে থাকবে।

.....

৩. কবিতাটি হাতে তালি দিয়ে একসাথে বলি।

৪. প্রশ্নের উত্তর বলি ও লিখি।

ক. কবিতায় কোন নদী পাড়ি দেবার কথা বলা হয়েছে?

খ. ধানের গন্ধে কবির কী মনে পড়ে?

গ. কবি গ্রামে যেতে চান কেন?

ঘ. কবির মতো করে তোমার দেখা একটি গ্রামের বর্ণনা দাও।

ঙ. তুমি বড়ো হয়ে কী হতে চাও? কেন হতে চাও? লেখো।

৫. বাক্য পূর্ণ করি।

ভালো লাগে গোলাপ ফুল,

মায়ের মাথার কালো চুল।

..... বেলা,

..... মেলা।

..... আছে,

..... কাছে।

..... মাছ,

..... গাছ।

৬. কোন বাক্য কোন ভাব প্রকাশ করে তা লিখি।

ইচ্ছা/ প্রশ্ন/ আদেশ/ অনুরোধ/ উপদেশ

আমি নদীর ওপারে যাবো। .....

আমাকে একটা কলম দিন। .....

স্বাস্থ্যের দিকে নজর রেখো। .....

আমি কি তোমার সাথে কথা বলতে পারি? .....

বই খুলে পড়তে বসো। .....

৭. 'যদি' যোগ করে বাক্য বড়ো করি।

ক. আমি আজ লিখতে পারতাম না, যদি আমার কাছে কলম না থাকত।

খ. নদী পার হতে পারতাম, যদি.....

গ. আমি ছবি আঁকতাম, যদি.....

ঘ. সে এখানে আসত, যদি .....

পাঠ ১৬

সোনার থালা

অনেক দিন আগের কথা। এক দেশে সেরিবান নামে এক ফেরিওয়ালা থাকতেন। তিনি কখনো লোভ করতেন না। সেখানে সেরিবা নামে আরও একজন ফেরিওয়ালা থাকতেন। সেরিবা ছিলেন খুব লোভী। একবার সেরিবান আর সেরিবা অন্ধপুর নগরে বাণিজ্য করতে গেলেন।

অন্ধপুরে সেই সময়ে এক বণিক পরিবার বাস করত। একসময় ওই বণিক পরিবার খুব ধনী ছিল। তবে ধন-সম্পদ হারিয়ে তারা গরিব হয়ে যায়। সেই পরিবারের কেবল বুড়ি ঠাকুরমা এবং তার এক নাতনি বেঁচে ছিল। তারা প্রতিবেশীর বাড়িতে কাজ করে অতি কষ্টে সংসার চালাতেন।

তাদের ছিল একটি সোনার থালা। বণিক যখন বেঁচে ছিলেন, সেই থালায় ভাত খেতেন। এখন আর সেই থালা কেউ ব্যবহার করে না। ধীরে ধীরে থালাটায় ময়লা জমতে শুরু করে। দেখেও বোঝা যাচ্ছিল না থালাটা সোনা দিয়ে তৈরি। ভাঙা থালা-বাটির সাথে সেটিকে রেখে দেওয়া হয়েছিল। বুড়ি ঠাকুরমাও থালাটির কথা ভুলে গিয়েছিলেন।

একদিন লোভী সেরিবা সেই বাড়ির পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। যেতে যেতে সুর করে বলছিলেন— 'জিনিস কিনি, জিনিস। কেউ কি পুরানো জিনিস বেচবেন?'

ফেরিওয়ালার ডাক শুনে নাতনি ঘর থেকে বেরিয়ে এলো। ফেরিওয়ালাকে বলল, 'তুমি কি পুরানো থালা কিনবে?'

'থালাটা দেখাও তো!' সেরিবা বললেন।

নাতনি সোনার থালাটি বের করে আনল। তারপর ঠাকুরমাকে বলল, 'ও ঠাকুরমা, এটা তো কোনো কাজে আসে না। এটা বিক্রি করে দিই?'

ঠাকুরমা বললেন, 'এটা বিক্রি করে কী করবে?'

নাতনির ছিল গয়না কেনার শখ। সে বলল, 'আমাকে গয়না কিনে দিয়ো।'

ঠাকুরমাও দেখলেন থালাটি কোনো কাজে আসে না। তাই তিনি বিক্রি করতে রাজি হলেন। ফেরিওয়ালাকে বললেন, 'এই থালার বদলে আমাদের কত টাকা দিতে পারবেন?'

সেরিবা থালাটা উলটে-পালটে দেখলেন। তাঁর মনে হলো এটি সোনার। তাই তিনি সুঁই দিয়ে থালার পিছনে দাগ দিলেন। নিশ্চিত হলেন থালাটি আসলেই সোনার। তিনি ভাবলেন, তাদের ঠকিয়ে এটি নিতে হবে। তাই বললেন, 'এর আবার দাম কী! এক টাকায় নিলেও ঠকা হয়।' এ রকম বলে তিনি থালাটা রেখে চলে গেলেন।

একটু পরেই সেই বাড়ির পাশ দিয়ে সেরিবান যাচ্ছিলেন। তিনিও হেঁকে বলছিলেন—'জিনিস কিনি, জিনিস। কেউ কি পুরানো জিনিস বেচবেন?'

আরেক ফেরিওয়ালার ডাক শুনে নাতনি আবার ছুটে এলো। ঠাকুরমাকে বলল, 'ঠাকুরমা, ডাক দাও না এই ফেরিওয়ালাকে!'

ঠাকুরমা বললেন, ‘নিজের কানেই তো শুনেছ। থালাটির কোনো দাম নেই। ঘরে বেচার মতো আর কোনো জিনিস নেই।’

নাতনি বলল, ‘সেই ফেরিওয়ালা ভালো না। ওর কথা শুনে গায়ে জ্বালা ধরে যায়। এই ফেরিওয়ালার ডাক কত মিষ্টি। ইনি বোধ হয় থালাটা নিতে রাজি হবেন। একবার দেখি না!’

ঠাকুরমা সেরিবানকে ডাকলেন। তারপর থালাটা তাঁর হাতে দিলেন। সেরিবান দেখেই বুঝলেন থালাটা সোনার। তিনি বললেন, ‘মা, এই থালার দাম লক্ষ টাকা। আমার কাছে তো এত টাকা নেই।’

ঠাকুরমা বললেন, ‘একটু আগে এক ফেরিওয়ালা এসেছিলেন। তিনি বললেন এর দাম এক টাকাও না। বোধ হয় আপনার পুণ্যের কারণে থালাটা সোনার হয়ে গেছে। আমরা এটা আপনাকেই দেব। তার বদলে আপনি যা ইচ্ছা দিন।’

সেরিবান তাদের এক হাজার টাকা দিলেন। তারপর সোনার থালাটা নিয়ে চলে গেলেন।

খানিক বাদে লোভী সেরিবা আবার বণিকের বাড়িতে এলেন। তিনি বললেন, ‘থালাটা দাও তো। যেতে যেতে ভাবলাম, কিছু টাকা দিয়ে এটা নিয়ে যাই। সেজন্য আবার এলাম।’

ঠাকুরমা বললেন, ‘সে কী কথা! আপনি তো বললেন ওটার দাম এক টাকাও হবে না। এইমাত্র একজন ফেরিওয়ালা এসে সেটি নিয়ে গেছেন। থালার বদলে এক হাজার টাকা দিয়ে গেছেন।’

ঠাকুরমার কথা শুনে লোভী সেরিবার মাথা ঘুরে গেল। তিনি তখন পাগলের মতো লাফালাফি শুরু করলেন। জিনিসপত্র সব ছুড়ে ফেলে হায় হায় করতে লাগলেন।

অর্থ জেনে নিই

পুণ্য — ভালো কাজ।

ফেরিওয়ালা — যিনি ঘুরে ঘুরে জিনিস বেচাকেনা করেন।

বণিক — ব্যবসায়ী।

অনুশীলনী

১. নিচের শব্দগুলো খালি জায়গায় বসিয়ে বাক্য লিখি।

গয়না	উদারতা	সোনার	সেরিবা	লোভী	সেরিবান	অন্ধপুরে

ক. সেরিবা ছিলেন খুব .....।

খ. ..... এক বণিক পরিবার থাকত।

গ. বণিক পরিবারে একটি ..... থালা ছিল।

ঘ. নাতনির ..... কেনার শখ।

ঙ. ..... মানুষকে মহান করে।

চ. ..... দেখেই বুঝলেন থালাটা সোনার।

২. শব্দ দিয়ে বাক্য লিখি।

ফেরিওয়ালা: .....

শখ : .....

বণিক : .....

সংসার : .....

উপস্থিত : .....

হতাশ : .....

৩. প্রশ্নের উত্তর বলি ও লিখি।

ক. অন্ধপুরে বণিকের পরিবারে কে কে ছিল?

খ. বুড়ি ঠাকুরমা থালাটির কথা ভুলে গিয়েছিলেন কেন?

গ. সেরিবা কী করে বুঝলেন থালাটি সোনার?

ঘ. সেরিবান থালা হাতে নিয়ে কী বললেন?

ঙ. সেরিবান আর সেরিবার স্বভাবের পার্থক্য কী?

৪. একশব্দে লিখি।

ক. যিনি ঘুরে ঘুরে জিনিস বেচাকেনা করেন —

খ. ব্যবসা করেন যিনি —

গ. যারা বাড়ির আশপাশে বাস করে —

ঘ. সাহস আছে যার —

ঙ. যা সহ্য করা যায় না —

৫. বিপরীত শব্দ লিখি।

প্রদত্ত শব্দ	বিপরীত শব্দ
ধনী	
পুরানো	
কেনা	
পুণ্য	
সাধু	
চেনা	
আলো	

৬. বাক্যগুলো সাজিয়ে গল্প তৈরি করি ও লিখি।

খবরে কিছু মানুষকে দেখানো হচ্ছে।

বাবা বললেন, ‘ঘূর্ণিঝড়ের কারণে ওরা বিপদে পড়েছে।’

বাবা টেলিভিশনে খবর দেখছিলেন।

রেবা জিজ্ঞেস করল, ‘ওদের কী হয়েছে?’

রেবা বলল, ‘আমরা কি ওদের জন্য কিছু করতে পারি, বাবা?’

ওই সময়ে রেবা তাঁর পাশে এসে বসল।

তারা সারি বেঁধে দাঁড়িয়ে খাবার নিচ্ছিল।

৭. ‘সোনার থালা’ গল্পটি পড়ে যা শিখলাম তা নিজের মতো করে বলি ও লিখি।

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

৮. ‘সোনার থালা’ গল্প কয়েকজন মিলে অভিনয় করে দেখাই।

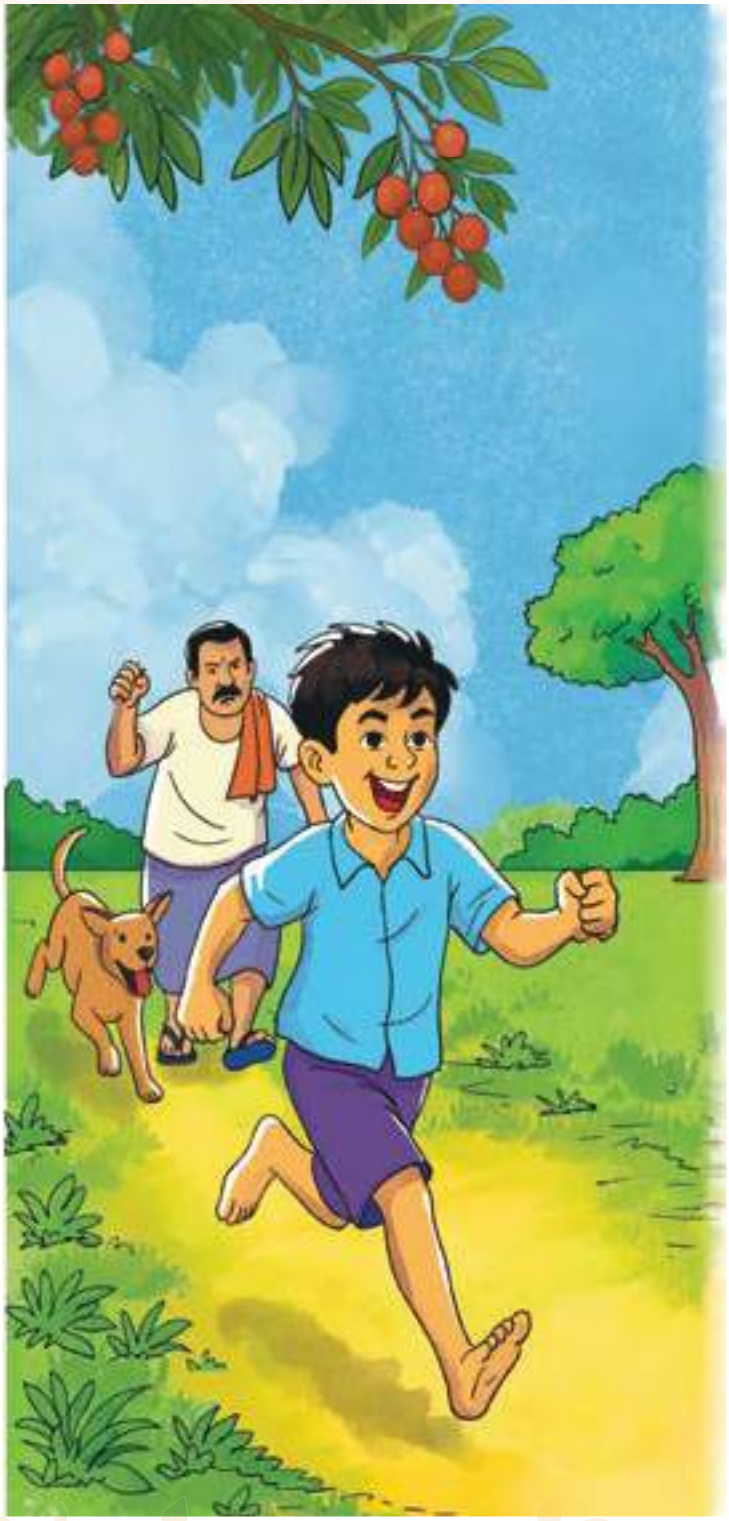

পাঠ ১৭

লিচু-চোর

কাজী নজরুল ইসলাম

বাবুদের তাল-পুকুরে
হাবুদের ডাল-কুকুরে
সে কি বাস্ করলে তাড়া,
বলি থাম, একটু দাঁড়া!
পুকুরের ওই কাছে না
লিচুর এক গাছ আছে না
হোথা না আস্তে গিয়ে
য়্যাব্বড় কাস্তে নিয়ে
গাছে গ্যে যেই চড়েছি
ছোটো এক ডাল ধরেছি,
ও বাবা, মড়াৎ করে
পড়েছি সড়াৎ জোরে!
পড়বি পড় মালীর ঘাড়েই,
সে ছিল গাছের আড়েই।
ব্যাটা ভাই বড়ো নচ্ছার,
ধুমাধুম গোটা দুচ্চার
দিলে খুব কিল ও ঘুসি
একদম জোরসে ঠুসি!
আমিও বাগিয়ে থাপড়
দে হাওয়া চাগিয়ে কাপড়

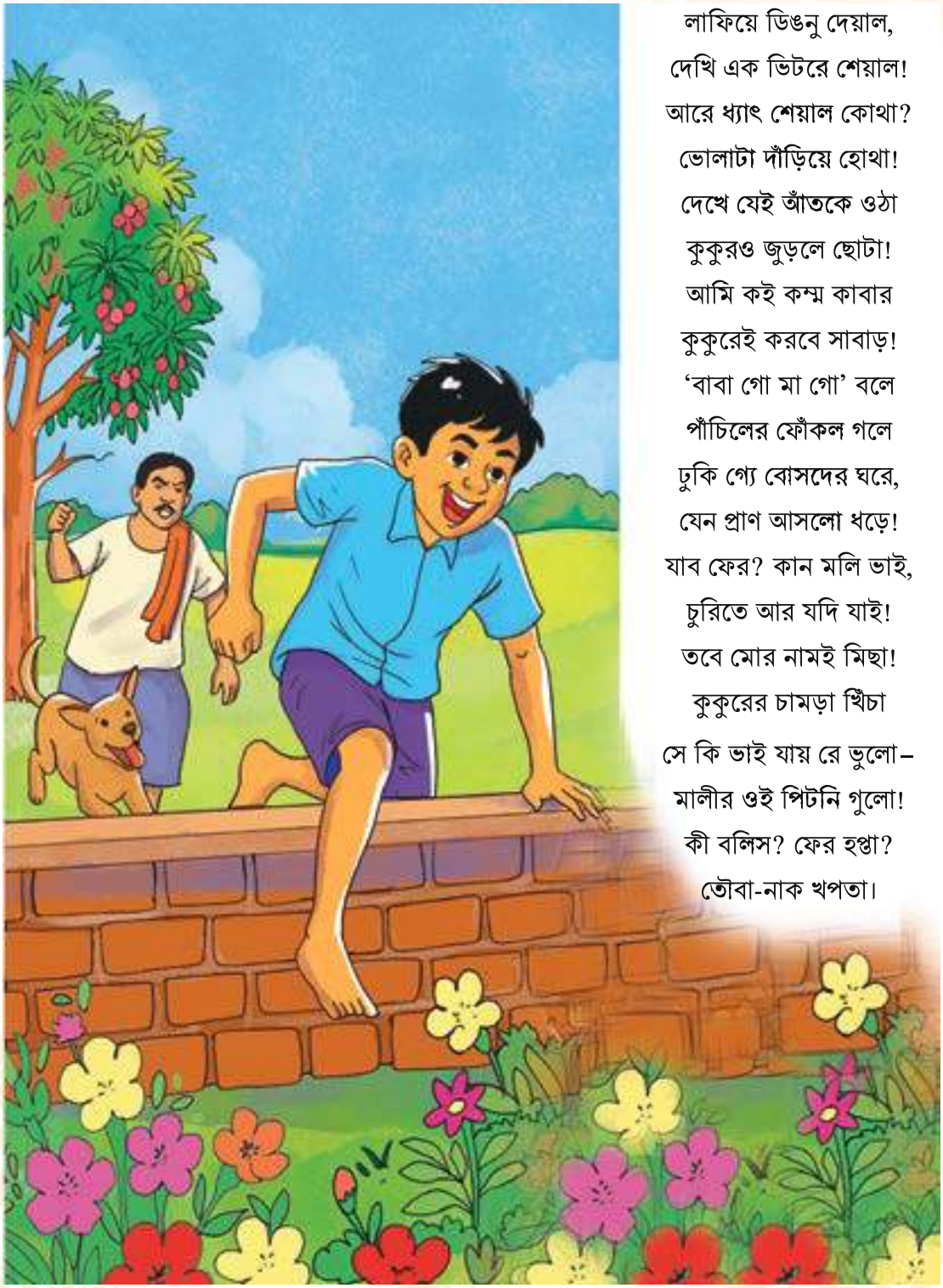

লাফিয়ে ডিঙনু দেয়াল,
দেখি এক ভিটরে শেয়াল!
আরে ধ্যাৎ শেয়াল কোথা?
ভোলাটা দাঁড়িয়ে হোথা!
দেখে যেই আঁতকে ওঠা
কুকুরও জুড়লে ছোটা!
আমি কই কম্ম কাবার
কুকুরেই করবে সাবাড়!
'বাবা গো মা গো' বলে
পাঁচিলের ফোঁকল গলে
ঢুকি গ্যে বোসদের ঘরে,
যেন প্রাণ আসলো ধড়ে!
যাব ফের? কান মলি ভাই,
চুরিতে আর যদি যাই!
তবে মোর নামই মিছা!
কুকুরের চামড়া খিঁচা
সে কি ভাই যায় রে ভুলো–
মালীর ওই পিটনি গুলো!
কী বলিস? ফের হপ্তা?
তৌবা-নাক খপতা।

অর্থ জেনে নিই

আঁতকে ওঠা — ভয়ে চমকে ওঠা।

গ্যে — গিয়ে।

ডাল-কুকুর — শিকারি জাতের কুকুর।

ডিঙনু — পার হলাম।

তাল-পুকুর — চারদিকে তালগাছ ঘেরা পুকুর।

ধড় — শরীর; দেহ।

পাঁচিল — ইটের দেওয়াল।

ফের হপ্তা — পরের সপ্তাহ।

য়্যাব্বড় — ইয়া বড়ো।

সাবাড় — খেয়ে শেষ করা।

হোথা — সেখানে।

অনুশীলনী

১. কবিতা থেকে মিল-শব্দ খুঁজে বের করি।

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

২. খালি জায়গায় বন্ধনীর প্রশ্নের উত্তর বসাই।

ক. বাড়ির চারদিকে ..... দেয়াল ছিল। (কেমন দেয়াল?)

খ. সে একটা ..... লাঠি নিয়ে তাড়া করল। (কেমন লাঠি?)

গ. দোয়েল ..... সুরে গান গায়। (কেমন সুরে?)

ঘ. এমন ..... লোক আর দেখিনি বাবা! (কেমন লোক?)

ঙ. ..... বাটিতে তরকারি রাখো। (কেমন বাটি?)

চ. গাছের ..... পাতায় আলো এসে পড়েছে। (কেমন পাতা?)

৩. আমি, তুমি, সে দিয়ে লিখি।

ক. আমি আঁতকে উঠলাম।

তুমি আঁতকে উঠলে।

সে আঁতকে উঠল।

খ. আমি বড়ো একটা কাস্তে নিয়ে গেলাম।

.....

.....

গ. আমি ছোটো একটা ডাল ধরেছি।

.....

.....

ঘ. আমি সাঁতরে নদী পার হবো।

.....

.....

৪. প্রশ্নের উত্তর বলি ও লিখি।

ক. লিচুগাছটি কোথায়?

খ. লিচু পাড়তে গিয়ে মালীর ঘাড়ে পড়তে হলো কেন?

গ. লিচু-চোরকে কে তাড়া করেছিল?

ঘ. লিচু-চোর কুকুরের তাড়া খেয়ে কোথায় গেল?

ঙ. লিচু-চোর কী প্রতিজ্ঞা করল?

৫. খালি জায়গায় শব্দ বসাও।

টগবগ	চিঁ চিঁ	মড়াৎ	হৈ হৈ	দুম দুম	সড়াৎ

ক. গাছের ডালটি ..... করে ভেঙে গেল।

খ. সে উপর থেকে ..... করে পুকুরে পিছলে পড়ল।

গ. ..... করে পানি ফুটছে।

ঘ. ছাদের উপর ..... করে আওয়াজ হচ্ছে।

ঙ. পাখির ছানা ..... করে ডাকছে।

চ. তার কথা শুনে সবাই ..... করে উঠল।

৬. 'লিচু-চোর' কবিতাটি আবৃত্তি করি।

পাঠ ১৮

মহীয়সী নারী

অনেক দিন আগের কথা। সেকালে মেয়েদের লেখাপড়ার প্রচলন ছিল না। তখন অভিভাবকেরা মেয়েদের স্কুলে যেতেই দিতেন না।

মেয়েদের থাকতে হতো ঘরের ভেতর বন্দি অবস্থায়। সমাজে ছিল অবরোধ প্রথা। অবরোধ মানে বাড়ির নির্দিষ্ট গণ্ডির মধ্যে আটকে থাকা। শুধু মেয়ে হওয়ার কারণে তাদের বন্দিজীবন কাটাতে হতো। মেয়েদের ছিল না লেখাপড়ার অধিকার। ছিল না বাইরে বের হওয়ার স্বাধীনতা। সামাজিক বিধিনিষেধের কারণে মেয়েরা লেখাপড়া করতে পারত না।

সে সময় জন্ম নিল ফুটফুটে এক শিশু। নাম তার রোকেয়া। রোকেয়া বড়ো হতে থাকে।

সকালে রোকেয়ার ঘুম ভাঙে পাখির ডাকে। পাখিদের তো ডানা আছে। পাখিরা উড়তে পারে। যখন যেখানে খুশি যেতে পারে। কিন্তু রোকেয়ার কোথাও যাওয়ার অনুমতি নেই। ঘরের বাইরে তো দূরের কথা, কারও সামনে যাওয়াও নিষেধ। এমনকি সে যদি মেয়ে হয়, তার সামনেও না।

একবার কয়েকজন অতিথি রোকেয়াদের বাড়িতে বেড়াতে এলেন। রোকেয়ার বয়স তখন পাঁচ বছর। আত্মীয়দের দেখে রোকেয়ার খুশি হওয়ার কথা। কিন্তু তাকে লুকিয়ে থাকতে হলো। কখনও চিলেকোঠায়, কখনও সিঁড়ির নিচে, কখনও-বা দরোজার আড়ালে।

রোকেয়ার খুব লেখাপড়া করার ইচ্ছে। কিন্তু সে স্কুলে যাবে কী করে? লেখাপড়াই-বা শিখবে কীভাবে? রোকেয়া তো চার দেয়ালের মধ্যে বন্দি। সে তো দমবার পাত্রী নয়। বাড়িতে পবিত্র কোরআন পড়া শিখল। উর্দুও শিখল। কিন্তু বাংলা শেখার জন্যও তার মন ছটফট করতে লাগল।

রোকেয়ার বড়ো ভাই ছিলেন শিক্ষিত। রোকেয়া তাঁর কাছে লেখাপড়া শেখার আবদার করল। তিনি রোকেয়ার অদম্য ইচ্ছা দেখে এগিয়ে এলেন। শুরু হলো লেখাপড়া শেখার আরেক লড়াই। ভাইয়ের কাছে আরম্ভ হলো তার জ্ঞানার্জন।

বাবা-মা তখন গভীর ঘুমে। সারা বাড়ি নিঝুম। মোমবাতি জ্বালিয়ে রোকেয়া বই খুলে বসেছে। এ বই সে বই থেকে ভাই তাকে পাঠ দিচ্ছেন। জ্ঞানের জন্য তৃষ্ণার্ত বোন রোকেয়া শিখছে কত কিছু। রাতের পর রাত এভাবেই কেটে গেছে। কখনো কখনো পড়তে পড়তে ভোর হয়ে গেছে। এভাবেই পড়া শিখেছে রোকেয়া।

রোকেয়ার বিয়ে হলো ষোলো বছর বয়সে। স্বামী সৈয়দ সাখাওয়াত হোসেন। বিয়ের দশ বছর পর তাঁর স্বামীর মৃত্যু হলো। এবার শুরু হলো রোকেয়ার আরেক জীবন।

মেয়েরা তখন অনেক পিছিয়ে। লেখাপড়া করার স্কুল নেই। মৃত্যুর আগে স্বামী কিছু অর্থ রেখে গিয়েছিলেন। রোকেয়া কলকাতায় স্বামীর নামে মেয়েদের জন্য একটি প্রাথমিক স্কুল প্রতিষ্ঠা করলেন। শুরুর দিকে এই স্কুলের ছাত্রী ছিল মাত্র পাঁচজন। কিন্তু আস্তে আস্তে সংখ্যা বাড়তে থাকল। রোকেয়া বুঝতে পারলেন, কেন মেয়েরা এত পিছিয়ে আছে। কত কথা তাঁর মনে, কত কিছু বলার ইচ্ছা। এবার তিনি বাংলা ভাষায় শুরু করলেন লেখালেখি। মনের সব কথা তুলে ধরলেন তাঁর লেখায়। এ লেখা তাঁকে বাংলা ভাষার অন্যতম লেখকের খ্যাতি এনে দিলো।

ছোটোবেলায়ই রোকেয়া দেখেছিলেন, মেয়েদের পড়ালেখার সুযোগ নেই। তাদের অল্প বয়সে বিয়ে দিয়ে স্বামীর ঘরে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। সারাজীবন মেয়েরা আর কিছুই করতে পারে না। বাইরে কাজ করার অধিকারও তারা পায় না। অথচ পড়ালেখা করে ছেলেরা। বাইরে কাজ করে ছেলেরা। রোকেয়া বুঝেছিলেন, মেয়েদেরও তো সেসব অধিকার থাকার কথা।

রোকেয়া বলেছেন, গাড়ির চাকাগুলোকে সমানভাবে চলতে হয়। সমভাবে না চললে সামনে এগোনো যায় না। সমাজে মেয়ে আর ছেলে হচ্ছে গাড়ির চাকার মতো। ছেলেদের তুলনায় মেয়েরা যদি পিছিয়ে থাকে, সেই সমাজের উন্নতি হতে পারে না।

রোকেয়া সারাজীবন মেয়েদের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য লড়াই করে গেছেন। তিনি চেয়েছেন নারী ও পুরুষের ঐক্য। তিনি ভেবেছেন, নারী-পুরুষের যৌথ চেষ্টাতেই এভাবেই এগিয়ে যাবে পিছিয়ে থাকা সমাজ।

এই মহীয়সী নারী ১৮৮০ সালের ৯ই ডিসেম্বর জন্মগ্রহণ করেছিলেন। ১৯৩২ সালের একই তারিখে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। নারী-জাগরণের অগ্রদূত হিসেবে তিনি চিরস্মরণীয়।

অর্থ জেনে নিই

গন্ডি — সীমানা।

অগ্রদূত — যিনি পথ দেখান।

ঐক্য — একতা; মতের মিল।

চিরস্মরণীয় — চিরদিন মনে রাখা যায় এমন।

চিলেকোঠা — ছাদের ওপর নির্মিত সিঁড়িসংলগ্ন ছোটো ঘর।

তৃষ্ণার্ত — যার পিপাসা পেয়েছে।

দমবার — থেমে যাওয়ার; হার মানার।

নিঝুম — সম্পূর্ণ নীরব।

বিধিনিষেধ — নিয়মের বাধা।

অনুশীলনী

১. শব্দ দিয়ে বাক্য লিখি।

অধিকার .....

ছটফট .....

শিক্ষিত .....

উন্নতি .....

অগ্রদূত .....

২. যুক্তবর্ণ ভেঙে দেখাই এবং শব্দ তৈরি করি।

যুক্তবর্ণ	শব্দ
জ্ঞ = জ+ঞ	জ্ঞান, বিজ্ঞাপন, বিজ্ঞ
ঞ্জ =	
জ্ব =	
ঙ্ক =	
ষ্ণ =	

৩. প্রশ্নের উত্তর বলি ও লিখি।

ক. কীসের ডাকে রোকেয়ার ঘুম ভাঙত?

খ. রোকেয়া কার কাছে লেখাপড়া শেখার আবদার করেছিলেন?

গ. রোকেয়াকে নারী জাগরণের অগ্রদূত কেন বলা হয়েছে?

ঘ. রোকেয়া কখন, কীভাবে লেখাপড়া করতেন?

ঙ. রোকেয়া মেয়েদের জন্য কেন স্কুল করেছিলেন? চারটি বাক্যে তোমার মতামত দাও।

৪. তারিখবাচক শব্দ লিখি।

ডিসেম্বর মাসের ৯ তারিখ ৯ই ডিসেম্বর

জ্যৈষ্ঠ মাসের ২ তারিখ .....

জুন মাসের ৪ তারিখ .....

আগস্ট মাসের ৫ তারিখ .....

ডিসেম্বর মাসের ১৬ তারিখ .....

মার্চ মাসের ২৬ তারিখ .....

৫. এককথায় প্রকাশ করি।

চিরদিন মনে রাখা যায় এমন —

বাড়িতে আগত ব্যক্তি —

যাকে দমন করা যায় না —

অনেকের মধ্যে একজন —

মহান যে নারী —

৬. পাঠ থেকে কে, কারা, কী, কেন, কোথায়, কীভাবে, কখন ইত্যাদি শব্দ ব্যবহার করে প্রশ্নবাক্য তৈরি করি।

ক. কে মেয়েদের জন্য স্কুল প্রতিষ্ঠা করলেন?

খ. .....

গ. .....

ঘ. .....

ঙ. .....

চ. .....

ছ. .....

পাঠ ১৯

লাল জামা

যাত্রাবাড়ির ছোট্ট একটা কলোনিতে ওরা থাকে। টুকি, টুকির মা, ভাই ও বাবা। গলির মোড়ে দর্জির দোকানে কাজ করেন বাবা। বাবার সামান্য আয়ে কোনোমতে দিন চলে ওদের।

টুকির ভাই রতন কলেজে পড়ে। চোখভরা স্বপ্ন তার। কয়েক দিন ধরেই টুকি দেখছে ভাইয়া খুব ব্যস্ত। ক্লাস থেকে দেরিতে ফেরে। সেদিন বলল, আমরা আজ রাস্তা বন্ধ করেছি। গাড়ি চলতে দেইনি।' টুকি বলল, 'কেন? রাস্তা বন্ধ করে তোমরা কী করছ?'

'আমরা প্রতিবাদ করছি। আমাদের দেশ, আমাদের সম্পদ। জনগণের সম্পদ রক্ষা করতে হবে।'

কৌতূহলী হয়ে টুকি জিজ্ঞেস করল, 'তোমাদের ভয় করে না?'

দৃঢ়কণ্ঠে ভাইয়া বলল, 'নাহ! কীসের ভয়! আমরা ভাষা-আন্দোলন করেছি, মুক্তিযুদ্ধ করেছি। আমাদের পূর্বপ্রজন্ম আমাদের শক্তি। আমরাও লড়াই করব।'

টুকি বলল, 'সাবধান।'

জানালার পাশে দাঁড়িয়ে টুকি এসব ভাবছিল। বাইরে কালো ধোঁয়া। গুলির শব্দ। কান বন্ধ হয়ে আসছে ওর। মাকে বলল, 'মা, আমার ভয় করছে।'

মা-ও খুব উদ্বিগ্ন। তিনি বললেন, 'তোর বাবা ফোন করেছিল। দোকানের ঝাঁপ বন্ধ করে কাজ করছে। বাইরে প্রচণ্ড গুলি হচ্ছে।' উৎকণ্ঠিত হয়ে মা বললেন, 'রতনকে নিয়ে আর পারি না। ওকে ফোনে পাচ্ছি না।'

মায়ের মুখে চিন্তার ছাপ। ঢকঢক করে এক গ্লাস পানি খেলেন তিনি।

টুকি বলল, 'বাবাকে এখনই চলে আসতে বলো।'

মা বললেন, 'তোর লাল জামাটার কাজ প্রায় শেষ। নিয়েই চলে আসবেন।'

টুকির মনে শঙ্কা। বাবা ও ভাইয়ের জন্য ওর মনটা কেমন গুমরে উঠল। একটা লাল জামার শখ ওর। বাবা খুব সুন্দর করে নকশা করেছেন। কিন্তু এখন আর জামা চায় না সে। ওর বুক ঢিব ঢিব করছে। মাকে বলল, 'বাবাকে আবার ফোন দাও।' ফোন কানে নিয়ে মা অপেক্ষা করলেন। কাউকেই পেলেন না।

ভয়ংকর শব্দ করে আকাশে চক্কর দিচ্ছে হেলিকপ্টার। পাশের বাসা থেকে রানু চাচির গলা শোনা যাচ্ছে। চিৎকার করে বলছেন, 'ও আল্লাহ, রহম করো। সবাই সাবধান। হেলিকপ্টার থেকে গুলি করছে।' টুকি জানালার পাশ থেকে সরে দাঁড়াল। আকাশ জুড়ে কালো মেঘের মতো ধোঁয়া। ঘরের ভেতর ঢুকে পড়েছে টিয়ারগ্যাসের গন্ধ।

বাইরে প্রচণ্ড শোরগোল। গলির মোড় থেকে সবাই ছুটে পালাচ্ছে। পাশের বস্তিতে আগুন জ্বলছে।

টুকিদের দরজায় শব্দ হলো। মা দরজা খুললেন, পেছনে টুকি। মা চিৎকার করে উঠলেন, 'কী হয়েছে?' ভিড়ের ভেতর থেকে কে যেন বলল, 'গুলি লেগেছে।' টুকি উঁকি দিয়ে দেখল রক্তে ভিজে গেছে রতনের সাদা শার্ট। দেখতে পেল ভাইয়ার নিথর শরীর। ঝাপসা হয়ে এলো টুকির চোখ। টুপটুপ করে ঝরে পড়ছে পানি। বুক ফেটে কান্না এলো ওর।

২০২৪ সালের ২১শে জুলাই। গভীর রাত। ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে মারা গেল রতন।

টুকি ভাবল, লাল জামার মতো টুকটুকে হয়ে গেছে ভাইয়ার শার্ট।

ও আর কোনোদিন লাল জামা পরবে না।

অর্থ জেনে নিই।

উৎকণ্ঠিত — চিন্তিত; ব্যাকুল হয়ে।

উদ্বিগ্ন — শঙ্কিত; দুশ্চিন্তাগ্রস্ত।

কৌতূহলী — আগ্রহী।

চক্কর — চক্রাকারে ঘোরা।

ব্যস্ত — জড়িত; নিযুক্ত।

রহম — দয়া।

শঙ্কা — ভয়; ভীতি।

শোরগোল — হইচই।

সম্পদ — সম্পত্তি।

অনুশীলনী

১. নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর বলি ও লিখি।

ক. টুকি ও তার পরিবার কোথায় বাস করে?

খ. রতন কীসের জন্য আন্দোলন করছিল?

গ. বাবার কী নিয়ে বাড়ি ফেরার কথা ছিল?

ঘ. মায়ের মুখে চিন্তার ছাপ কেন?

ঙ. টুকি আর কোনোদিন লাল জামা পরবে না কেন?

চ. ‘আমাদের পূর্বপ্রজন্ম আমাদের শক্তি’ – রতন কেন এ কথা বলেছিল?

২. যুক্তবর্ণগুলো ভেঙে দেখাই এবং নতুন শব্দ তৈরি করি।

ছোট্ট	ট্ট		
বন্ধ	ন্ধ		
রক্ষা	ক্ষ		
প্রচণ্ড	ণ্ড		

৩. শব্দ বেছে নিয়ে খালি জায়গায় লিখি।

শক্তি	ব্যস্ত	সাবধানে	কৌতূহলী	স্বপ্ন

ক. ... ... পথ চলতে হবে।

খ. সুমন কাজে ... ... হয়ে পড়েছে।

গ. আমি মা-বাবার ... ... পূরণ করব।

ঘ. পুষ্টিকর খাবার খেলে গায়ের ... ... বাড়ে।

ঙ. গল্পটি তাকে ... ... করে তুলল।

৪. নিচের এলোমেলো শব্দ সাজিয়ে বাক্য লিখি।

কলেজে টুকির পড়ে ভাই। .....

ফেটে এলো বুক কান্না ওর। .....

জাতীয় দোয়েল আমাদের পাখি। .....

জামা পছন্দ লাল আমার খুব। .....

রাজধানী বাংলাদেশের ঢাকা। .....

৫. শুনে লিখি।

নয়ন চতুর্থ শ্রেণির শিক্ষার্থী। সে বই পড়তে খুব ভালোবাসে। পাঠ্যবইয়ের পাশাপাশি তার গল্পের বই পড়তে ভীষণ ভালো লাগে। গত বছর বইমেলা থেকে সে বেশ কয়েকটি বই কিনেছে। রূপকথা, কল্পবিজ্ঞান, আর ধাঁধার বইগুলো নয়নকে খুব আনন্দ দেয়।

৬. বাক্যের পাশে সঠিক বিরামচিহ্ন বসিয়ে পুনরায় খাতায় লিখি।

আজ সকালে রিনার মা বললেন ☐ রিনা ☐ স্কুলে যেতে দেরি করছো কেন ☐ রিনা বলল ☐ না মা ☐ আমি তো প্রস্তুত ☐ সে স্কুলের পথে রওনা হলো ☐ পথে গিয়ে দেখলো ☐ পাখিরা কিচিরমিচির করছে ☐ সূর্য হাসছে ☐ গাছে ফুল ফুটেছে ☐ রিনা বলল ☐ আহা ☐ কী সুন্দর সকাল ☐

৭. অল্পকথায় গল্পটি বলি ও লিখি।

.....

.....

.....

.....

.....

পাঠ ২০

চারদিকে দেখি

গ্রীষ্মের ছুটিতে আয়েশা গ্রামের বাড়িতে যাচ্ছে। আয়েশার পাশে বসে আছেন তার মা। পাশের আরেক সিটে বসেছেন বাবা। বাসের অন্যান্য সিটে আরও অনেক যাত্রী।

হঠাৎ রাস্তার পাশে একটা জিনিসে চোখ পড়ল আয়েশার। একটা নিচু ফলকে লেখা: জামালপুর ৩৮ কি. মি.। এটা আবার কী? মাকে জিজ্ঞেস করার আগেই গাড়ি অনেক দূরে চলে গেল।

একটু পরে আরেক জায়গায় আয়েশা দেখতে পেল: জামালপুর ৩৭ কি.মি.। সে এবার মাকে জিজ্ঞেস করল, 'মা তুমি কি বলতে পারো, জামালপুর ৩৭ কি.মি. মানে কী?'

মা শুরুতে কথাটা বুঝতে পারেননি। পরে বুঝতে পেরে বললেন, 'এর নাম মাইলফলক। এটা দিয়ে বোঝানো হচ্ছে, জামালপুর পৌঁছাতে ৩৭ কিলোমিটার বাকি।'

আয়েশা বাইরে তাকিয়ে প্রকৃতি দেখতে থাকে। খানিক পরে দেখা গেল আরেকটা মাইলফলক। সেখানে লেখা আছে: জামালপুর ৩৬ কি.মি.।

'বাহ্, দারুণ তো!' আয়েশা বলে। 'তার মানে জামালপুর আরও ৩৬ কিলোমিটার দূরে।'

এবার বাবা বলে উঠলেন, 'আচ্ছা, আমরা এখন কোথায় আছি বলতে পারো?'

আয়েশা বলল, 'না তো!'

বাবা বললেন, 'চারদিকে তাকিয়ে দেখো। তারপর দেখি বলতে পারো কি না!'

বাস চলছে। আয়েশা চারপাশে তাকিয়ে শুধু দোকান আর দোকান দেখছে। কিন্তু জায়গার নাম জানা যায় কীভাবে?

আয়েশা দেখল, মা মিটিমিটি হাসছেন।

তারপর গাড়ি এক জায়গায় থামতেই আয়েশা নাম পেয়ে গেল। দোকানের সাইনবোর্ডের ভিতরেই তো জায়গার নাম দেওয়া আছে!

আয়েশা আঙুল দিয়ে সাইনবোর্ডের দিকে দেখাল। বলল, 'বাবা, ওই যে! নিচের লাইনেই জায়গার নাম।'

সংকেত বুঝি

যখন বামে যাওয়া যাবে না	বামে মোড় নিষেধ
যখন ডানে যাওয়া যাবে না	ডানে মোড় নিষেধ
যখন পুরোপুরি ঘুরে আসা যাবে না	ইউটার্ন নিষেধ
যখন সামনের গাড়ি অতিক্রম করা যাবে না	ওভারটেকিং নিষেধ
সর্বোচ্চ কত জোরে চালানো যাবে সেটি যখন দেখানো থাকে	সর্বোচ্চ গতিসীমা
কোথাও গাড়ির গতি কমানোর দরকার হলে	গতিরোধক

যখন আশপাশে স্কুল-কলেজ বা হাসপাতাল থাকে	হর্ন বাজানো নিষেধ
যে রাস্তায় রিকশা চালানো যাবে না	রিকশা চলাচল নিষেধ
যেখান দিয়ে রাস্তা পার হওয়া যাবে না	রাস্তা পারাপার নিষেধ
রাস্তার পাশে স্কুল আছে বোঝাতে	সামনে স্কুল
রাস্তার পাশে হাসপাতাল আছে বোঝাতে	সামনে হাসপাতাল

সংকেত বুঝে খেলি

ছক্কায় ১ উঠলে খেলা শুরু করি।

শেষ	৯৯		৯৭	৯৬	৯৫	৯৪	৯৩	৯২	৯১
৮১	৮২	৮৩	৮৪	৮৫	৮৬	৮৭		৮৯	৯০
৮০	৭৯	৭৮	৭৭		৭৫	৭৪	৭৩	৭২	৭১
৬১	৬২	৬৩		৬৫	৬৬	৬৭	৬৮	৬৯	৭০
৬০	৫৯	৫৮	৫৭	৫৬		৫৪	৫৩	৫২	৫১
৪১	৪২	৪৩	৪৪	৪৫	৪৬	৪৭		৪৯	৫০
৪০	৩৯		৩৭	৩৬	৩৫	৩৪	৩৩	৩২	৩১
২১	২২	২৩	২৪	২৫		২৭	২৮	২৯	
২০	১৯	১৮	১৭	১৬	১৫	১৪		১২	১১
শুরু	২	৩	৪		৬	৭	৮	৯	১০

নির্দেশনা

৫ সামনে স্কুল। ধীরে চলার জন্য এক চাল অপেক্ষা করো।

১৩ এখানে ময়লা ফেলুন। জায়গামতো ময়লা ফেলার জন্য চার ঘর এগিয়ে যাও।

২৬ হর্ন বাজাবেন না। হর্ন না বাজানোর জন্য আরেক চাল বোনাস পাবে।

৩০ সাইকেল চলার রাস্তা। সাইকেল নিয়ে ছয় ঘর এগিয়ে যাও।

৩৮ এই টয়লেট মহিলাদের। এই ঘরে কোনো ছেলে ঢুকলে দশ ঘর পিছিয়ে যাও।

৪৮ রিকশা চলা নিষেধ। রিকশা নিয়ে ঢোকার জন্য ১৬ নং ঘরে চলে যাও।

৫৫ এই টয়লেট পুরুষদের। এই ঘরে কোনো মেয়ে ঢুকলে দশ ঘর পিছিয়ে যাও।

৬৪ সামনে হাসপাতাল। তিন চাল অপেক্ষা করো।

৭৬ সামনে চলুন। সোজা ৭৬ থেকে ৯৬ নং ঘরে চলে যাও।

৮৮ গতিরোধক। দুই ঘর পিছিয়ে যাও।

৯৮ এখান দিয়ে রাস্তা পার হওয়া নিষেধ। রাস্তা পার হতে গিয়ে দুর্ঘটনার কারণে ৬৪ নং ঘরে— হাসপাতালে যাও।

পাঠ ২১

ভয় পেয়ো না

সুকুমার রায়

ভয় পেয়ো না, ভয় পেয়ো না, তোমায় আমি মারব না—
সত্যি বলছি কুস্তি করে তোমার সঙ্গে পারব না।
মনটা আমার বড্ড নরম, হাড়ে আমার রাগটি নেই,
তোমায় আমি চিবিয়ে খাব এমন আমার সাধ্যি নেই!
মাথায় আমার শিং দেখে ভাই ভয় পেয়েছ কতই না—
জানো না মোর মাথার ব্যারাম, কাউকে আমি গুঁতোই না?

এসো এসো গর্তে এসো, বাস করে যাও চারটি দিন,
আদর করে শিকেয় তুলে রাখব তোমায় রাত্রিদিন।
হাতে আমার মুগুর আছে তাই কি হেথায় থাকবে না?
মুগুর আমার হালকা এমন মারলে তোমায় লাগবে না।
অভয় দিচ্ছি, শুনছ না যে? ধরব নাকি ঠ্যাং দুটা?
বসলে তোমার মুণ্ডু চেপে বুঝবে তখন কাণ্ডটা!
আমি আছি, গিন্নি আছেন, আছেন আমার নয় ছেলে—
সবাই মিলে কামড়ে দেব মিথ্যে অমন ভয় পেলে।

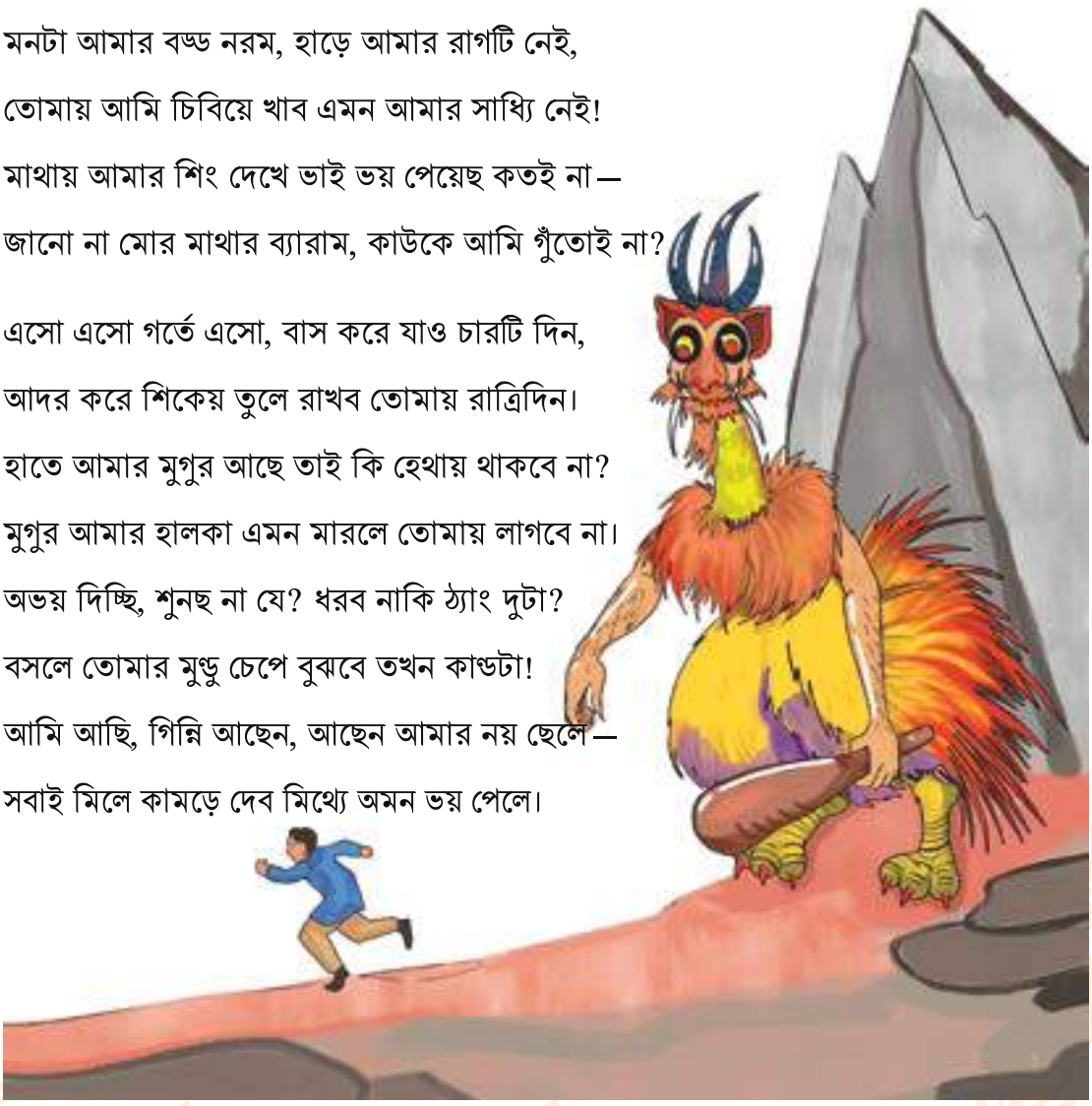

অর্থ জেনে নিই

ব্যারাম — রোগ।

শিকে — শিকা; দড়ি দিয়ে বানানো হাঁড়ি ঝুলিয়ে রাখার সরঞ্জাম।

সাধ্যি — সাধ্য; সামর্থ্য।

অনুশীলনী

১. আমি, তুমি, সে দিয়ে লিখি।

ক. আমি মারব না।

.....

.....

খ. আমি প্রতিদিন সেখানে যাই।

.....

.....

গ. আমি আম খেতে ভালোবাসি।

.....

.....

ঘ. আমি কাউকে না পেয়ে একা একাই বেড়াই।

.....

.....

২. ডান দিক থেকে কথা এনে বামপাশে লিখি।

তোমায় আমি	গুঁতোই না।
কুস্তি করে	পারব না।
হাড়ে আমার	রাগটি নেই।
চিবিয়ে খাব	থাকবে না?
কাউকে আমি	সাধ্যি নেই।
তাই কি হেথায়	মারব না।

৩. পাঠ থেকে একই অর্থের শব্দ খুঁজি।

স্ত্রী —

সাথে —

সাহস —

মুণ্ডু —

পা —

অসুখ —

৪. প্রশ্নের উত্তর লিখি।

ক. প্রাণীটি দেখতে কেমন?

খ. প্রাণীটি কাদের নিয়ে কোথায় থাকে?

গ. লোকটা যেন ভয় না পায় তার জন্য প্রাণীটি কী কী ভালো কথা বলেছে?

ঘ. লোকটার ভয় পাওয়ার কী কী কারণ আছে, তা লেখো।

৫. কবিতার শব্দকে গদ্য ভাষায় লিখি।

কবিতার শব্দ	গদ্য ভাষায় যা হবে
গুঁতো	গুঁতা
সাধ্যি	
শিকে	
রাত্রিদিন	
হেথায়	

৬. বিপরীত শব্দ লিখি এবং সেগুলো দিয়ে অনুচ্ছেদের খালি জায়গা পূরণ করি।

প্রদত্ত শব্দ	বিপরীত শব্দ
বাইরে	
কান্না	
সাহস	
খোলা	
শেষ	
উপরে	

বিকেলে ঝড় ..... হলো। আমি ভীষণ ..... পেয়ে গেলাম। মা ডাক দিয়ে বললেন, 'তাড়াতাড়ি ঘরের ..... চলে এসো।' আমি ঘরে ঢুকতেই মা দরজা-জানালা ..... করে দিলেন। ছোটো ভাইটা দেখি ভয়ে টেবিলের ..... লুকিয়েছে। দেখে আমার ..... পেল।

পাঠ ২২

খলিফা উমর (রা.)

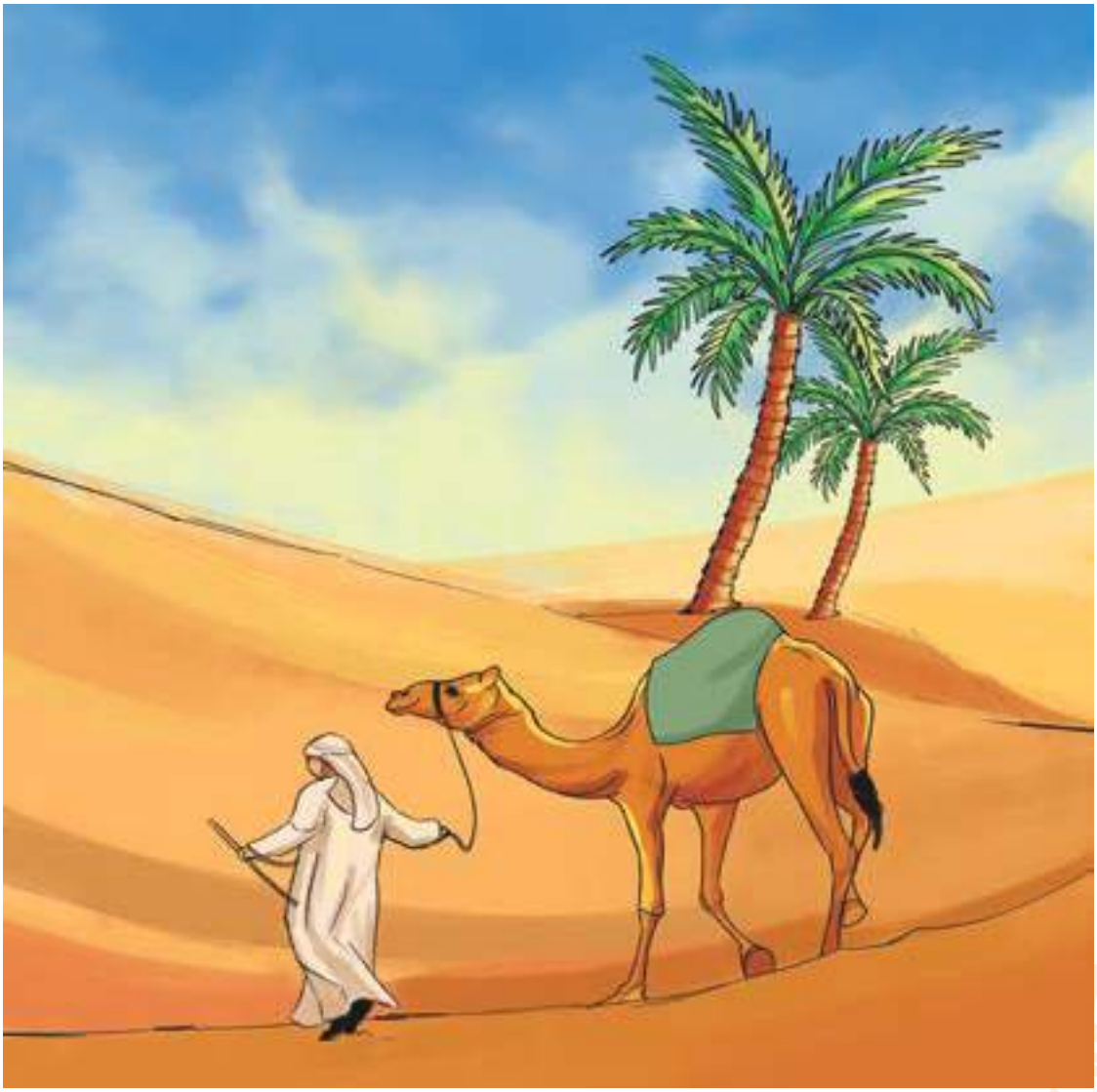

হজরত উমর (রা) ৫৮৩ সালে মক্কা নগরে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম খাত্তাব এবং মাতার নাম হানতামাহ। তাঁর উপাধি ফারুক। ফারুক অর্থ সত্য-মিথ্যার পার্থক্যকারী।

উমর (রা) ছিলেন ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা। তিনি শিক্ষিত, মার্জিত ও সৎ চরিত্রের অধিকারী ছিলেন। বাল্যকালে তিনি শিক্ষাদীক্ষায় সুনাম অর্জন করেন। বড়ো হয়ে ব্যবসা-বাণিজ্য করেন। তিনি ছিলেন নামকরা কুস্তিগির, সাহসী যোদ্ধা, কবি ও সুবক্তা।

হজরত উমর (রা) ছিলেন ন্যায়পরায়ণ শাসক। তিনি মানুষের সমব্যথী ছিলেন। নগরবাসীদের অবস্থা বোঝার জন্য তিনি রাতের বেলায় ঘুরে বেড়াতেন। মানুষের দুঃখ-কষ্ট বোঝার চেষ্টা করতেন। এক রাতে তিনি ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন। এমন সময়ে একটি ঘর থেকে ক্ষুধার্ত শিশুর কান্না শুনতে পেলেন। তিনি নিজের ঘরে ফিরে নানা রকম খাবার একটি বস্তায় ভরে নিলেন। তারপর সেটি কাঁধে নিয়ে ক্ষুধার্ত শিশুদের ঘরে পৌঁছে দিলেন।

আর এক রাতের ঘটনা। উমর (রা) শহরের কাছাকাছি এক তাঁবুর পাশ দিয়ে হাঁটছিলেন। এমন সময়ে তাঁবুর ভেতর থেকে প্রসব বেদনায় কাতর এক বেদুইন নারীর আর্তস্বর শব্দ শুনতে পেলেন। তিনি তখনই বাসায় চলে আসেন। স্ত্রী উম্মে কুলসুমকে নিয়ে যান সেই তাঁবুতে। উম্মে কুলসুম বেদুইন নারীর সন্তান প্রসবে সহায়তা করেন।

উমর (রা.) এর চোখে উঁচু-নিচু, ধনী-গরিব ভেদ ছিল না। খলিফা হিসেবে একবার তিনি জেরুজালেম শহরে যাচ্ছিলেন। বাহন হিসেবে একটি মাত্র উট। সাথে একজন ভৃত্য। জেরুজালেম অনেক দূরের পথ। তাই রওনা দেওয়ার আগে ভৃত্যকে বললেন, 'এতখানি পথ তুমি একা উটের রশি টেনে নিয়ে যেতে পারবে না। তাই একবার তুমি উটে চড়বে, আর একবার আমি।'

কিছু দূর যাওয়ার পর উমর (রা) উটের পিঠ থেকে নামলেন। এবার ভৃত্য উঠলেন উটের পিঠে। আর খলিফা উটের রশি ধরে তপ্ত বালুর উপর দিয়ে হেঁটে যেতে থাকলেন। এভাবে পালাক্রমে দুজনে পুরো পথ চললেন। চলতে চলতে তাঁরা জেরুজালেম শহরের তোরণে পৌঁছালেন। তখন উটের পিঠে ছিলেন ভৃত্য। জেরুজালেমের লোকজন উটের পিঠে বসা ভৃত্যকে খলিফা ভেবে অভ্যর্থনা জানাল। ভৃত্য তখন বলেন, তিনি নন, বরং উটের রশি ধরে থাকা ব্যক্তিটিই খলিফা। এতে জেরুজালেমের লোকজন অবাক হয়ে গেল। উমর (রা.) ছিলেন এমনই এক মহানুভব শাসক।

এই জনদরদি শাসকের কথা লোকমুখে শুনতে পান রোমান সম্রাট। তিনি পত্র দিয়ে এক দূত পাঠান। সম্রাটের দূত মদিনায় এসে রাজপ্রাসাদ খুঁজতে থাকেন। তিনি কোনো রাজপ্রাসাদ খুঁজে পেলেন না। এক ব্যক্তি দূতকে বললেন, 'আমাদের খলিফার কোনো প্রাসাদ নেই। তিনি ওই দিকের এক খেজুর গাছের ছায়ায় বিশ্রাম নিচ্ছেন।' রোমান সম্রাটের দূত সেখানে গিয়ে দেখলেন,

সত্যিই খলিফা খেজুর গাছের ছায়ায় বসে আছেন। দূত বুঝলেন, উমর (রা) অর্ধ জাহানের শাসক হয়েও কত সাধারণ জীবনযাপন করতেন।

খলিফা হজরত উমরের (রা) ন্যায়পরায়ণতা, মহানুভবতা ও উদারতা আমাদের অনুপ্রেরণা জোগায়। তাঁর জীবনাদর্শ আমাদের জন্য অনুসরণীয়। তিনি ৬৪৪ সালে মক্কায় মৃত্যুবরণ করেন।

অর্থ জেনে নিই

অর্ধ জাহান — অর্ধেক দুনিয়া।

আর্তস্বর — কাতর ধ্বনি।

ক্রীতদাস — টাকার বিনিময়ে কেনা ব্যক্তি যাকে দিয়ে কাজ করানো হয়।

খলিফা — শাসক।

তপ্ত — গরম।

দূত — রাজার প্রতিনিধি।

প্রভেদকারী — যিনি পার্থক্য করেন।

নগরবাসী — নগরের অধিবাসী।

পালাক্রমে — একজনের পর আরেকজন।

বেদুইন — আরবের যাযাবর জাতি।

মার্জিত — ভদ্র।

সমব্যথী — পরের দুঃখে কাতর।

অনুশীলনী

১. পাঠ থেকে জোড়াশব্দ খুঁজে বের করি এবং নিজের মতো বাক্য তৈরি করি।

জোড়াশব্দ	বাক্য
উঁচু-নিচু	উঁচু-নিচু পথ দিয়ে হেঁটে চলেছি।
.....	.....
.....	.....
.....	.....
.....	.....
.....	.....

২. এককথায় লিখি।

নগরে বাস করেন যারা —

সাহস আছে যার —

যিনি কবিতা লিখেন —

যিনি যুদ্ধ করেন —

যিনি কুস্তি লড়েন —

সুন্দর করে বক্তব্য দেন যিনি —

৩. প্রশ্নের উত্তর বলি ও লিখি।

ক. উমর ফারুক (রা) কত সালে, কোথায় জন্মগ্রহণ করেন?

খ. হজরত উমরের (রা) কী কী গুণ ছিল?

গ. খলিফা উমরের (রা) মহানুভবতার একটি ঘটনা বর্ণনা করো।

ঘ. ‘একবার তুমি উটে চড়বে, আর একবার আমি।’ — খলিফা উমর (রা) কাকে, কেন এই কথা বলেছিলেন?

ঙ. হজরত উমরের (রা) জীবন থেকে কী কী শেখার আছে?

৪. শব্দ সাজিয়ে বাক্য লিখি।

অধিকারী তিনি চরিত্রের সৎ।

.....

করেন অর্জন তিনি সুনাম শিক্ষায়-দীক্ষায়।

.....

কাজে হব আমরা মনোযোগী।

.....

গুণ একটি মহানুভবতা বড়ো।

.....

অর্থ সত্য ফারুক প্রভেদকারী ও মিথ্যার।

.....

৫. ছক থেকে শব্দ নিয়ে বাক্য লিখি।

	আগে	এখন	পরে
আমি/ আমরা	পড়তাম, পড়েছিলাম	পড়ি, পড়ছি, পড়েছি	পড়ব, পড়তে থাকব
তুমি/ তোমরা	পড়তে, পড়েছিলে	পড়ো, পড়ছো, পড়েছ	পড়বে, পড়তে থাকবে
সে/ তারা	পড়ত, পড়েছিল	পড়ে, পড়ছে, পড়েছে	পড়বে, পড়তে থাকবে

ক. .....

খ. .....

গ. .....

ঘ. .....

ঙ. .....

চ. .....

৬. আজ করেছি বা করব এমন একটি ভালো কাজের বিবরণ নিচে লিখি।

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

পাঠ ২৩

পাঠাগারের সদস্য হই

ফুলপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়। জনাব মো. জামসেদ আলি এই বিদ্যালয়ের একজন শিক্ষক। তিনি বিদ্যালয়ের পাঠাগার পরিচালনার দায়িত্ব পালন করেন। আজ নোটিশ বোর্ডে তিনি একটি বিজ্ঞপ্তি টাঙিয়ে দিয়েছেন। বিজ্ঞপ্তিতে শিক্ষার্থীদের পাঠাগারের সদস্য হওয়ার আহ্বান জানানো হয়েছে।

এখন বিদ্যালয়ে টিফিন বিরতি। রাশেদ, তিথি, মরিয়ম এবং আরও কয়েকজন নোটিশ বোর্ডের সামনে দাঁড়াল। তারা সেখানে একটি নোটিশ দেখতে পেল।

বিজ্ঞপ্তি

তারিখ: ১৮ই অক্টোবর ২০২৫

প্রিয় শিক্ষার্থী

আমাদের বিদ্যালয়ের পাঠাগার সকল শিক্ষার্থীর জন্য উন্মুক্ত। তবে তোমরা বই বাড়িতে নিয়েও পড়তে পারো। এজন্য একটা ফরম পূরণ করতে হবে। পাঠাগারের সমন্বয়কের কাছ থেকে ফরমটি সংগ্রহ করার জন্য অনুরোধ জানানো হলো।

মো. জামসেদ আলি

সহকারী শিক্ষক

ফুলপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়

ফুলপুর।

ছুটির পরে শিক্ষার্থীরা জামসেদ স্যারের কাছে গেল। তারা বলল, ‘আমরা পাঠাগারের সদস্য হতে চাই।’ জামসেদ স্যার তাদের একটি করে ফরম দিলেন।

ফুলপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় পাঠাগার সদস্য ফরম	
শিক্ষার্থীর নাম	:
পিতার নাম	:
মাতার নাম	:
শ্রেণি	:
রোল নম্বর	:
জন্ম-তারিখ	:
ঠিকানা	:
অভিভাবকের মোবাইল নম্বর	:

স্বাক্ষর ও তারিখ

পরদিন তারা জামসেদ স্যারের কাছে পূরণ করা ফরম নিয়ে এলো। তিনি ফরম দেখে বললেন, ‘বাঃ! সুন্দর হয়েছে। এখন থেকে পাঠাগারের সদস্য হিসেবে বই নিয়ে পড়তে পারবে। তোমরা অন্যদেরও পাঠাগারের সদস্য হতে বলতে পারো।’

অনুশীলনী

১. বিজ্ঞপ্তি লিখি।

সহপাঠীদের লেখা নিয়ে একটি দেয়াল পত্রিকা বের করতে চাই। লেখা পাঠানোর আহ্বান জানিয়ে একটি বিজ্ঞপ্তি লিখি।

২. ফরম তৈরি করি।

বিদ্যালয় পরিচ্ছন্ন রাখার জন্য সহপাঠীরা মিলে ‘পরিচ্ছন্নতা সংঘ’ বানিয়েছি। অন্য শ্রেণির শিক্ষার্থীদের সংঘের সদস্য করার জন্য একটি নমুনা ফরম তৈরি করি।

আমার বাংলা বই কেমন লেগেছে– লিখে রাখি।

আমার নাম :

রোল নম্বর :

বিদ্যালয়ের নাম :

তারিখ :

সমাপ্ত

২০২৬ শিক্ষাবর্ষের জন্য, ইবতেদায়ি চতুর্থ শ্রেণি–বাংলা

হাত ধুই সুস্থ থাকি।

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য